১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

জলসা বিশেষ সংখ্যা

The Fortnightly Ahmadi

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ১৪-১৫তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ০৩ ফাল্গুন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ১৪ রবি. সানি, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ তবলিগ, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ঈসাব্দ

এক নেতা, এক জামা'ত

One Leader, One Community

৯০তম জলসা সালানা ২০১৪ মুবারক হোক

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

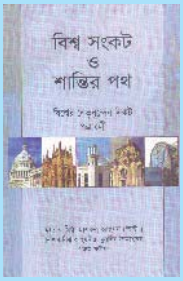

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯০তম জলসা সালানা ২০১৪ সফল হউক

মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৯০তম জলসা আগামী ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমরা মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে এই মহতী জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করছি এবং সকলের কাছে দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

জলসার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "এ জলসার লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জামা'তের সদস্যগণ যেন এভাবে বার বার পরস্পর সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পবিত্র-পরিবর্তন সাধন করে, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে ঝুঁকে যায়। আর তাদের ধর্মভীরুতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, পরহেযগারী, সহানুভূতি, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধে তারা যেন অন্যদের জন্য একটা আদর্শে পরিণত হয়। নম্রতা, বিনয় ও সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর ধর্মীয় উৎকর্ষের জন্য তারা যেন পরিশ্রমের রাস্তা বেছে নেয়" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৬ পৃঃ ৩৯৪)।

তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, "যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে বন্ধুদের কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান সত্যনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনানো হবে যা আস্থা, ঈমান ও ধর্মীয়-ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক। এছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। আরহামুর রাহেমীন (সবচেয়ে বড় দয়ালু)-এর দরবারে বিশেষ আকুতি জানানো হবে, আল্লাহ্ যেন এদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং নিজ বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। একটি সাময়িক উপকার এটাও তারা লাভ করবেন, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামা'তে শামিল হয়েছেন, নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন, পরিচিত হবেন এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে উন্নতি লাভ করবেন।.....এ আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক আধ্যাত্মিক উপকার লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে" (ইশতিহার ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ইং, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৫২)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) গত ৩০ জুলাই, জুমুআর খুতবার একাংশে বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসা সম্পর্কে বলেছেন, "এ জলসার আহ্বান ও আসল উদ্দেশ্য ছিল এইঃ আমাদের জামা'তের লোক কিভাবে বার বার সাক্ষাতে নিজের মাঝে পরিবর্তন লাভ করে, যেন তাদের মন আখেরাতের প্রতি পূর্ণভাবে ঝুঁকে যায় আর তাদের মাঝে খোদা তা'লার ভয় সৃষ্টি হয়। তারা সাধনা, তাকওয়া, খোদাভীতি ও পরহেযগারী আর কোমল হৃদয় ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে যায়। বিনয়, নম্রতা ও নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়, আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে উৎসাহ লাভ করে।"

আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় আমাদের দেশে এ বরকত-মন্ডিত জলসা প্রতিবছরই হয়ে আসছে। বরকতপূর্ণ এই জলসা সকলের অংশগ্রহণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আধ্যাত্মিক এক নব-উন্মেষের সূচনার কারণ হোক আর আমাদের রাষ্ট্রীয়-জীবনেও প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনুক, এটাই আমাদের প্রার্থনা।

জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই
আন্তরিক মুবারকবাদ

সূচিপত্র

৩১ জানুয়ারি ও ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
১৬ আগষ্ট ২০১৩-এর **জুমুআর খুতবা** ৬

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
২৩ আগষ্ট ২০১৩-এর **জুমুআর খুতবা** ১৫

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এর **জুমুআর খুতবা** ২২

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)
হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ২৯

পবিত্র কুরআনের অলৌকিক নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব
আব্দুল গনী জাহাঙ্গীর খান ৩৪

প্রত্যহ দরূদ শরীফ পাঠের বরকত এবং তওবা ও এস্তেগফার
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ৩৯

কলমের জিহাদ
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ৪২

**হযরত ইমাম মাহদী (আ)-এর জীবদ্দশায়
প্রথম ও শেষ সালানা জলসা**
মাওলানা জাফর আহমদ ৪৮

**অমুসলিমদের ওপর হামলা, কি বলে
পবিত্র কুরআন**
মাহমুদ আহমদ সুমন ৫২

কলম সৈনিক রঙ্গু চৌধুরী স্মরণে
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ৫৫

ঐশী খিলাফতের আনুগত্য মু'মিনদের জন্য ফরয
এস. এম. মাহমুদুল হক ৫৭

**১৯৯০ সনে চুয়াডাঙ্গায় কায়েদ সম্মেলন ও
প্রাসঙ্গিক কিছু কথা**
মোহাম্মদ বশীর উদ্দীন, মিরপুর ৫৯

কবিতা- ৬১

প্রবাসী আহমদীদের কথা-
**দক্ষিণ কোরিয়া'র ১৮তম সালানা জলসায়
আমরা ক'জন বাঙ্গালী** ৬৩

পাঠক কলাম- প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা
আনোয়ারা বেগম, ফারহানা মাহমুদ তন্বী,
বুশরা মজিদ, আহমদ উজ্জ্বল, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান ৬৪

সংবাদ ৬৮

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৭৮

আপনার সন্ধানে আছি! ৭৯

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩
পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৮০

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ হিজ্‌র-১৫

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٠﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ
الْأَوَّلِينَ ﴿١١﴾
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٢﴾

১০। নিশ্চয় আমরাই এ উপদেশ বাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী[১৪৮২]।*

* ১১। আর আমরা তোমার পূর্বেও পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন প্রাচীন সম্প্রদায়ের মাঝে রসূলদের পাঠিয়েছিলাম।

১২। আর তাদের কাছে কখনই এমন কোন রাসূলই অসেনি, যার সাথে তারা হাসি-বিদ্রূপ না করেছে।

১৪৮২। এই আয়াতে কুরআন করীমকে অবিকলরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি আছে, তা এমন স্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে যে অন্য কোন প্রমাণ যদি না-ও থাকতো, তবু এই সত্যই এর (কুরআনের) এলাহী-উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো। এই সূরা এমন এক সময়ে মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণের (রা.) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল। চরম অপচেষ্টা দ্বারা তাঁকে ধ্বংস করার জন্য কাফিরদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং এই সাথে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ্ তা'লা ব্যর্থ করে দিবেন। কারণ তিনি (আল্লাহ্) স্বয়ং এর হেফাযতকারী। এই দাবী ছিল দ্ব্যর্থহীন ও খোলাখুলি এবং শত্রু-পক্ষ ছিল শক্তিশালী ও নির্মম। তথাপি কুরআন যাবতীয় বিকৃতি, প্রক্ষেপ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপদ থেকে অভ্যাহতভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছে। কুরআনের বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচক স্যার উইলিয়ম মুইরও বলেছেন, "আমরা খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক রচিত (?) 'কুরআনের প্রতিটি বাক্যই অপরিবর্তিত, অবিকৃত এবং অকৃত্রিম রয়েছে।....অন্যান্য প্রত্যেক প্রকারের বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সংরক্ষিত মূলগ্রন্থ যা আমাদের নিকট রয়েছে, তা-ই মুহাম্মদ (সা.), স্বয়ং প্রণয়ন (?) করেছিলেন এবং তা-ই প্রচার করতেন...তাদের গ্রন্থের অবিমিশ্র মূল রচনার সাথে আমাদের ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন পাঠের তুলনা করা আর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা করা একই কথা।" (Introduction to the life of Mohammad)।

জার্মানীর খ্যাতনামা প্রাচ্য-ভাষাবিদ অধ্যাপক নোলডিকি লিখেছিলেন, 'কুরআনের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রক্ষেপের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য ইউরোপীয় পন্ডিতদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে" (এনসাইকো ব্রিট)। বেশ কয়েক বছর পূর্বে কুরআনের মূল-পাঠের শুষ্কতার মধ্যে ডা: মিন্‌গানা কর্তৃক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টার চরম ব্যর্থতা কুরআনের দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছে যে, অবতীর্ণ হওয়া সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র পবিত্র কুরআনই সব রকম প্রক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১২৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

* [আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে কুরআন শরীফ সুরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা এক স্থায়ী প্রতিশ্রুতি। যখনই কুরআন করীমের ভুল ব্যাখ্যা করা হয় বা ভুল অর্থ আরোপ করা হয়, তখনই আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে কোন না কোন আধ্যাত্মিক পুরুষকে তা সংশোধনের জন্য প্রেরণ করে থাকেন (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

হাদীস শরীফ

জলসায় যোগদানের কল্যাণ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'লার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন, যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান, যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী-আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা ঃ এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তাআলা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)।

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারা তো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন, সেও বঞ্চিত হবে না।

অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায়, তখন ফেরশ্‌তাগণও আকাশে চলে যান। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমারই ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্‌না করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি যাচ্‌না করছিল'?

ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্‌না করছিল'। আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না, তারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না, তারা তা দেখে নি।' তিনি বলেন, 'তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।'

তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচ্‌না করেছে, তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল, তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারা তো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন, সেও বঞ্চিত হবে না।"

(মুসলিম, কিতবুয্ যিক্‌র)।

অমৃতবাণী

জলসার গুরুত্ব

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জলসায় যোগদানের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বলেন-

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথাবার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে, যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন।

এ সব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক কল্যাণ এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামা'তে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন, আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিক ভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচ্‌না করা হবে। এছাড়া আরো বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল কৃদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না। এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।

জলসায় যোগদানে আকাঙ্খী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে, তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ-খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যার পথ-খরচের সামর্থ আছে, সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়), প্রয়োজনীয় দ্রব্য, ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তা'লা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না।

এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না। এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামা'তের ভিত্তি-প্রস্তর খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম, যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।

(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৩)

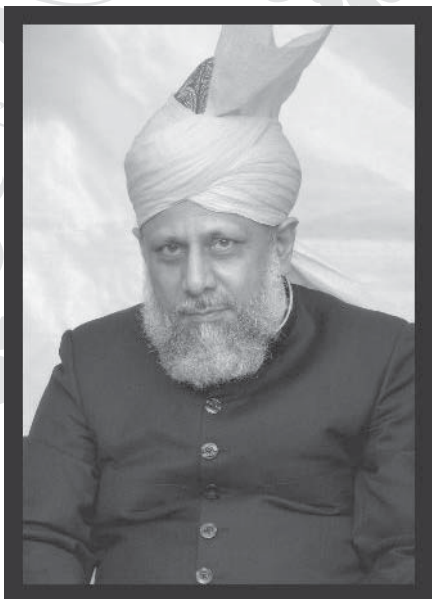

জুমুআর খুতবা

“আমি মহানবী (সা.)-এর হারানো সম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা বিশ্ববাসীকে দেখানোর নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছি।”

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ আগষ্ট ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ তায়াউয, তাস্‌মিয়া এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছু দিন হলো, এক কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতার সময় ধর্মীয় তরবিয়তের বিষয়ের একটি জরিপ ঘটনাক্রমে আমার সামনে আসে।

এরপর আমি তার কাছ থেকে এ বিষয়ে লিখিত রিপোর্টও আনিয়ে নিই। এটি দেখে আমার মনে হলো, এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি আলোকপাত করে আমার কিছু বলা উচিত। এগুলো জামা'তের এক শ্রেণীর লোকদের জন্য আবশ্যক। তেমনিভাবে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে, যা জামা'তের কর্মকর্তাদের জন্যও প্রয়োজন।

এ বিষয়গুলো একদিকে যেমন এখানকার জামা'তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিশ্বের অন্যান্য জামা'তের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। অথবা নতুন প্রজন্ম এবং সেসব সদস্যদেরও জানা প্রয়োজন, যারা খুব বেশী সক্রিয় নন বা জামা'তের কাজের সাথে খুব বেশী সম্পৃক্ত নন। এগুলো এমন বিষয়, যা সাধারণত খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করা হয় না। অথবা মুরব্বী এবং কর্মকর্তাগণ জামা'তের সদস্যদের সামনে গুছিয়ে, সুন্দর করে উপস্থাপন করেন না, যেমনটি করা উচিত। যার ফলে কারো কারো মাথায় বিশেষভাবে যুবকদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হলেও প্রশ্ন করেন না। আর এর কারণ হলো, তারা হয়তো ভাবেন, জামাতি পরিবেশ বা তাদের কোন নিকট-আত্মিয় বা পিতা-মাতা এসব প্রশ্ন শুনে খারাপ ভাবতে পারেন। বা তারা কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেতে পারেন।

অথচ তাদের উচিত ছিল, মুরুব্বী এবং মুয়াল্লেমদের কাছে বা কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখেন, তাদের কাছে বা খোদ্দামুল আহমদীয়া, লাজনার সদস্য ও সদস্যা তাদের প্রত্যেকের সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংগঠনের কর্মকর্তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া। আর এদের সাথে স্ব স্ব অঙ্গসংগঠনের সম্পর্ক এমনই হওয়া উচিত, যেন সাচ্ছন্দে প্রশ্ন করে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন এবং নিজেদের মাঝে যেসব সন্দেহ রয়েছে, তা দূর করতে পারেন বা আপনারা আমার কাছেও লিখতে পারেন। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেকে আমার কাছে লিখেও থাকেন। কখনও কখনও এখান থেকেও একান্ত শিষ্টাচারের সাথে লিখে থাকেন। আর এদের প্রশ্নের উত্তরও দেয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়টিও সামনে এসেছে, অনেক কর্মকর্তাও নিজ নিজ কর্তব্য এবং কর্মপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না এবং নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না।

আমি যে বিষয়গুলো বলতে যাচ্ছি, এর মাঝে একটি দিক আকিদা এবং এ বিষয়টি জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, আমাদের জানা উচিত, কেন আমরা কোন একটি আকিদায় প্রতিষ্ঠিত আছি এবং একইভাবে কিছু বিষয় যা আমাদের করতে বলা হয়, যে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সে বিষয়েও জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, কেন আমাদেরকে বলা হচ্ছে এবং একজন আহমদী মুসলমানের জন্য কেন এটি জরুরী? এর মাঝে একটি হলো, আর্থিক কুরবানী- এবিষয়ে লোকেরা জানতে চায়। দ্বিতীয়ত: কর্মকর্তাদের কিছু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক-দায়িত্বাবলী রয়েছে- এগুলো

আমি মুবাল্লেগদেরও স্মরণ করাতে চাই, আপনাদেরও উচিত নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। আপনাদের দায়িত্বাবলীর মাঝে জামা'তে কুরআন পড়ানোর ব্যবস্থা করাও একটি দায়িত্ব। আপনারা যদি কোন সফরে যান, সেক্ষেত্রে এমন শিক্ষক তৈরি করুন, যারা শিশু-কিশোরদেরকে এবং যারা কুরআন নাযেরা জানেন না তাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতে পারেন। আর এটি নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন হলো- এমন যেন না হয়। মাগরিব বা এশার সময় যখনই সময় পান পড়ান। আর যদি মুরব্বী ও মুবাল্লেগগণ সফরে না থাকেন, তিনি যদি নিজ সেন্টারে উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি তার সেন্টারে ক্লাস নিবেন।

কীভাবে পালন করবে এবং তাদের ক্ষমতা বা দায়িত্ব কতটুকু। যাহোক, সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রসঙ্গে এ দুটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

প্রথমটি সম্পর্ক রাখে আকিদার সাথে এবং একজন আহমদীর এটি জানা আবশ্যক। সাধারণত এ বিষয়ে আলোকপাত হতে থাকে, কিন্তু আমাদের নিজেদের লোকদেরও তরবিয়তের প্রয়োজন আছে– এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে আলোকপাত করা হয় না। সাধারণভাবে মনে করা হয়, একজন জন্মগত-আহমদী, সে হয়ত এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত আছে। কিন্তু সে কি জানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কী উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাকে মান্য করা কেন জরুরী? নবাগতরা তো এটি ভালভাবে জানেন, কেননা তারা পড়ালেখা করে, গবেষণা করে বয়াত করে থাকেন।

কিন্তু যারা তেমন সক্রিয় নন, ইজতেমাগুলোতে সঠিকভাবে আসেন না, জলসায় অংশগ্রহণ করেন না- এমন লোক সল্প সংখ্যাক হলেও সবদেশেই রয়েছে। এদের প্রতি গভীর উদ্বেগের সাথে দৃষ্টি দেয়া উচিত, আর এজন্য খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সংগঠনকেও নিজ নিজ কর্মসূচী তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করা একান্ত আবশ্যক। তেমনিভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনারও উচিত, এমন লোকদেরকে তিরস্কার না করে বা তাদের সংশোধন হতে পার না- এমন কথা না বলে তাদেরকে কাছে টানার চেষ্টা করা।

তবে যারা অকপটে বলে দেয়, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু এমন লোকদের ক্ষেত্রেও জামা'তের মূল ব্যবস্থাপনার উচিত তাদের তথ্যাদি অংগ সংগঠনকে দিয়ে দেয়া। কেননা, কখনও কখনও কোন কোন বড় কর্মকর্তার কঠোর আচরণের কারণে অনেকে এমন বলে দেয়। অংগ সংগঠন তাদের সমবয়সী বা প্রায় একই মেজাজের লোকদের মাধ্যমে তাদের সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। যেখানে যেখানে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, আল্লাহ্ তালার ফজলে সফলতাও লাভ হয়েছে। কোন কোন স্থানে এমনও সেক্রেটারী তরবিয়ত আছেন, যারা তরবিয়তের লক্ষ্যে তাদের স্বভাবগত অবস্থাকে সামনে রেখে কর্মসূচী তৈরি করেছেন এবং এর ভাল ফল হয়েছে, এর সুপ্রভাব পড়েছে। তাদের পক্ষ থেকে ভাল রেস্পন্স পাওয়া গেছে। যাহোক, প্রত্যেক আহমদীকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এটি প্রত্যেক কর্মকর্তা, প্রত্যেক মুরব্বী, সর্বস্তরের অংগসংগঠনের এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব।

নীতিগত এই কথার পর আমি প্রথম যে কথাটি বলতে চাই, যেমনটি আমি বলেছি তাহলো, প্রত্যেক আহমদীর জানা প্রয়োজন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? তাঁকে মান্য করা কেন জরুরী? এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভাষাতেই বলা সঙ্গত মনে করেছি। তিনি (আ.) বলেছেন,

আমি মহানবী (সা.)-এর হারানো সম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা বিশ্ববাসীকে দেখানোর নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছি। আর এসব কাজ প্রতিনিয়ত হচ্ছে, কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে, তারা এগুলো দেখতে পায় না। অথচ এখন এই জামা'ত সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, আর এই জামা'তের নিদর্শন ও সত্যতার এত লোক সাক্ষী আছে যে, তাদেরকে যদি একত্র করা হয়, তাহলে তাদের সংখ্যা এত সংখ্যাক হবে যে, পৃথিবীর বুকে কোন বাদশাহ্‌রও এমন বিশাল বাহিনী নেই।

চাঁদা দাতাদের এমন চিন্তা রাখা উচিত যে, তারা চাঁদা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, এটি তাদের প্রতি খোদা তা'লার একটি পরম অনুগ্রহ। এমন নয় যে, কোন ব্যক্তির প্রতি বা জামা'তের প্রতি বা আল্লাহ্ তা'লার জামা'তের প্রতি তারা চাঁদা দিয়ে অনুগ্রহ করছে। অতএব প্রত্যেক চাঁদা দাতাকে নিজেদের মাঝে এই চিন্তা ধারা রাখতে হবে যে, তারা চাঁদা দিয়ে খোদা তা'লার আশিষের উত্তরাধিকারী হবার চেষ্টা করছেন। ঐশী জামা'তের জন্য আর্থিক কুরবানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তিনি (আ.) বলেন, জামা'তের ***সত্যতার এমন এমন নিদর্শন রয়েছে যে, এর সবগুলো বর্ণনা করাও সহজসাধ্য নয়। যেহেতু ইসলামের চরম তাচ্ছিল্য ও অবমাননা করা হয়েছিল, তাই আল্লাহ তা'লা এই তাচ্ছিল্য ও অবমাননার হিসেবে এই জামা'তকে মর্যাদা ও সম্মানও দেখিয়েছেন। (মলফূযাত : ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৯, সংস্করণ-২০০৩, রাবওয়া)***

আর এটি কেবল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশারই কথা নয়, বরং তিনি তাঁর রচনাবলীতে, তার পুস্তকাদিতে, তার বিভিন্ন বক্তব্যে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার বিষয়ে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে যেভাবে আলোকপাত করে গেছেন, এগুলো আজও মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে শত্রুদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করছে।

আমি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছি। অমুসলিমের সামনে যখন মহানবী (সা.)-এর সীরাতের সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়, তখন তারা বলতে বাধ্য হন, যদি তাঁর সীরাত এমনই হয়ে থাকে, তার শিক্ষা যদি এমনই হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে আমরা ভ্রান্তির মাঝে ছিলাম। আমি কিছুদিন পূর্বে কোন এক বক্তৃতায় কানাডার এক ইসলাম- বিদ্বেষীর উদাহরণ দিয়েছিলাম যে, তাদের ড্যানিশ- পত্রিকায় তার এক প্রবন্ধে কার্টূনও প্রকাশ করেছিল, সে এবারকার সফরে যখন আমার বক্তব্য শুনেছে এবং ইসলামের অনিন্দ-সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছে, তখন সে তাদের পত্রিকায় লিখতে বাধ্য হয়েছে যে, আহমদীয়া জামা'তের ইমামের কথা শুনে আমি প্রকৃত-সত্য জেনে গেছি এবং পাশাপাশি সে তার ভুলও স্বীকার করেছে। তেমনিভাবে বিগত এক খুতবায় আমি বলেছিলাম, আমেরিকার এক বড় রাজনীতিক জুমআর বিষয়ে বিভ্রান্তিকর অনুষ্ঠান তাদের রেডিওতে প্রচার করে বা এ বিষয়ে কথা বলে, আর এই রেডিওর শ্রোতা প্রায় লাখ খানেক।

এ প্রেক্ষিতে, আমাদের এক আহমদী যুবক জুমআর গুরুত্ব ও মাহত্ম পবিত্র কুরআনের আলোকে কী?–এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে ওয়েব সাইটে তুলে দেয়। এরপর সেই ব্যক্তিকে, যিনি সেখানকার বড় রাজনৈতিক-নেতা এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, তাকে লিখে, তুমি ভুল বলেছ, তাই এখন আমাদেরকেও রেডিও-তে সময় দাও। অতঃপর সেই ব্যক্তি সময় দেয়। যাহোক, তার মাঝে ভদ্রতা ছিল। আল্লাহ তালার ফজলে আমাদের সেই আহমদী যুবক সেই রেডিও-তে জুমআর মাহাত্ম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আলোকে কথা বলেছে। এর ফলে সে স্বীকার করেছে যে, আমার ভুল হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানও লক্ষ লোক শুনেছে। সেই ব্যক্তি একথাও স্বীকার করে যে, আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত-ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে যা কিছু বলে গেছেন এবং যেসব তত্ত্বজ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচণ করেছেন, এসব কিছুর কারণ হলো, আল্লাহ্ তালা তাকে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত করেছিলেন, যেন তিনি মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট করেন এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও মাহত্ম এবং এর শিক্ষাকে জগদ্বাসীর কাছে স্পষ্ট করেন।

অতএব তিনি (আ.) যেমন বলেছেন, ইসলাম কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মাহত্ম ধরাপৃষ্ঠে পুনরায় তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অতএব আমাদের মাঝে কোন ধরণের হীনমন্যতার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় এবং যুবকদের এ বিষয়ে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়চিত্ততা থাকা উচিত। যেখানে যেখানে যুবকরা সক্রিয়, সেখানে আল্লাহ তালার ফজলে তারা আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ করছে।

এরপর আমাদের সকলের এ বিষয়টিও জানা আবশ্যক যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করা কেন জরুরী? তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়েরাও এ প্রশ্ন করে থাকে। পিতা-মাতা তাদের এমন প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেন না। এ প্রসঙ্গে আমি আবারো হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় বলছি, এটি একটি বিস্তারিত-বক্তব্য, এটিকে অংগসংগঠন পরবর্তীতে খন্ড খন্ড করে ব্যবহার করতে পারে এবং এথেকে

বিস্তারিত পথনির্দেশ লাভ করতে পারে। একবার কিছু মৌলভী তাঁকে প্রশ্ন করলো, আমরা এখন নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমানও রাখি। এ সত্ত্বেও আপনাকে মান্য করা কেন আবশ্যক? তিনি (আ.) এর উত্তরে বললেন,

"দেখ! যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূল এবং কিতাবে ঈমান রাখার দাবী করে, আর এর শিক্ষামালা যেমন নামায, রোযা , হজ্জ, যাকাত, তাকওয়া তাহারাত পালন করে না এবং আত্মার সংশোধন করা, মন্দ পরিহার করা এবং পুণ্য অর্জনের বিষয়ে যেসব বিধিনিষেধ রয়েছে তা পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি মুসলমান আখ্যায়িত হবার যোগ্য নয়।" মুসলমান হবার দাবী করছে কিন্তু সে সকল পুণ্যকাজ করে না, মন্দ কর্ম পরিহার করে না, উত্তম পন্থা অবলম্ব করে না।

তিনি (আ.) বলেন, "এমন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলার অধিকার রাখে না এবং তার ওপর ঈমানের অলঙ্কারে সুসজ্জিত হবার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় না। তেমনিভাবে, যে মসীহ মাওউদ (আ.)-কে মানে না বা মানা আবশ্যক মনে করে না, সে-ও ইসলামের গুঢ় তত্ত্ব এবং নবুওয়তের উদ্দেশ্য ও রিসালতের লক্ষ্য সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত।" অর্থাৎ সে বুঝেই না নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা কী? এর কী কী উদ্দেশ্য? "আর সে প্রকৃত মুসলমান এবং আল্লাহ্‌র প্রকৃত অনুগত-বান্দা আখ্যায়িত হবার যোগ্যই নয়।

আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে বিধিনিষেধ দিয়েছেন, তেমনিভাবে আখেরী যুগে একজন আখেরী খলীফার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও জোরালোভাবে দিয়েছেন। আর তাঁর অমান্যকারী এবং তাঁর থেকে যারা বিমুখ হবে তাদের নাম 'ফাসেক' রেখেছেন। কুরআন এবং হাদীসে শব্দগত যে পার্থক্য (তা কোন পার্থক্য নয় বরং ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের ব্যখ্যা করা হয়েছে মাত্র।) রয়েছে তা হলো, পবিত্র কুরআনে খলীফা শব্দ বলা হয়েছে এবং হাদীসে এই আখেরী খলীফাকে মসীহ মাওউদ নাম ব্যবহার করে ব্যখ্যা করা হয়েছে।

অতএব পবিত্র কুরআন যে-ব্যক্তির আবির্ভাবের বিষয়ে 'ওয়াদা' (অর্থাৎ অঙ্গিকার) শব্দ ব্যবহার করেছে, তেমনিভাবে যে ব্যক্তির আবির্ভাবকে এক বিশেষ বিশেষত্ব ও মাহত্ম দান করেছে, সে কেমন মুসলমান যে বলে তাঁকে মান্য করার আমাদের প্রয়োজন কী?"

তিনি (আ.)বলেন, "ইসলামে খলীফার আগমনকে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন এবং ইসলামের একটি বিশেষত্ব ও মাহত্ম হলো, এর সমর্থন ও নবায়নের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ এসেছেন এবং আসতে থাকবেন। দেখ! আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-কে হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন।"

অনেকে মুজাদ্দেদের বিষয়ে কখনও কখনও ভুল করে বসেন, যদি মুজাদ্দেদ আসতে থাকেন, তাহলে কে হবেন? জেনে রাখুন, খলীফাই মুজাদ্দেদ হবেন আর এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত একটি খুতবাও দিয়েছি। তা থেকেও বিভিন্ন নোট নেয়া যেতে পারে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অত্যান্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন। জামা'তের বিভিন্ন বই-পুস্তকেও এগুলো রয়েছে।

তিনি বলেন, "দেখ! আল্লাহ তালা মহানবী (সা.)-কে হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন আর এটি 'কামা' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত। মুসা (আ.)-এর শরীয়তের শেষ-খলীফা ছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। যেমন তিনি নিজেই বলেন, আমিই শেষ ইট। তেমনিভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়তেও এর খেদমত ও নবায়নের জন্য সব যুগেই খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবেন। এভাবে সাদৃশ্যকে বজায় রেখে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রেক্ষিতে শেষ-খলীফার নাম মসীহ মাওউদ রাখা হয়েছে। আর তাঁর উল্লেখ সাধারণভাবে করা হয় নি, বরং তাঁর আগমনের লক্ষণাবলী সকল ঐশী-গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাইবেল, ইঞ্জিল, হাদীস এবং স্বয়ং পবিত্র কুরআনে তার আগমনের লক্ষণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সকল জাতি যেমন ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুসলমান সবাই তার আবির্ভাবে বিশ্বাস করে এবং সবাই অপেক্ষমান। তাকে অমান্য করা কীভাবে ইসলামের শিক্ষা হতে পারে? আর তার ব্যক্তিত্ব এমন, যার জন্য আকাশেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন এবং ভূ-ধামেও তিনি মোজেজা বা নিদর্শন দেখিয়েছেন। তার সমর্থনে প্লেগ হলো এবং ভবিষ্যদ্বানীতে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হলো। অতএব এমন ব্যক্তি, যার সমর্থনে আকাশ নিদর্শন প্রকাশ করে এবং পৃথিবীও বলে উঠে 'আল ওয়াক্ত' অর্থাৎ এটিই সেই সময়- সে কি কোন সাধারণ-ব্যক্তিত্ব হতে পারে, যাকে মানা না মানা সমান? তাকে না মেনেও মুসলমান এবং খোদার প্রিয়-বান্দা হবে? কখনও নয়।"

তিনি বলেন, "স্মরণ রেখো, প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আগমনের সকল লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের নৈরাজ্য পৃথিবীকে নোংরা করে দিয়েছে। মুসলমান আলেম উলামা এবং অধিকাংশ ওলি-আওলিয়া এই যুগকেই প্রতিশ্রুত মসীহর যুগ আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, সেই মহাপুরুষ চতুর্দশ শতাব্দীতেই আবির্ভূত হবেন।" তিনি বলেন, "আওলিয়াদের এবং অধিকাংশ আলেম-ওলামার সম্মিলিত সাক্ষ্যের পরও যদি কেউ সন্দেহ রাখে, তবে তার উচিত পবিত্র কুরআনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা এবং সূরা নূর গভীর মনোযোগের সাথে পড়া। দেখ, হযরত মুসা (আ.)-এর চৌদ্দশত বছর পর যেমন হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন, তেমনিভাবে মহানবী (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতেই প্রতিশ্রুত মসীহ আবির্ভূত হয়েছেন।

আর যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) মুসাঈ সিলসিলার খাতামুল খুলাফা ছিলেন, তেমনিভাবে এ ধারাতেও প্রতিশ্রুত মসীহ খাতামুল খুলাফা হবেন।" (মলফুযাত : ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৫৫১-৫৫২, সংস্ককরণ-২০০৩, রাবওয়া) অর্থাৎ এখানে জেনে রাখুন, তিনি খাতামুল খুলাফার বিষয়ে বলেছেন, আমি শেষ হাজার বছরের জন্য খলীফা আর এর পর যে-ই আসবে সে তাঁর অনুসরণেই আসবে।

সুতরাং যেসব ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহর চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করার কথা ছিল, আর এটি পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই সেই প্রতিশ্রুত

আমি সকল জামা'তকে বলেছি, নও-মোবাঈন এবং শিশু-কিশোরদেরও ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় বেশী বেশী অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করুন, এক পয়সা দিয়েও যদি কেউ এতে শামিল হয়, হোক, যেন সে এতে অভ্যস্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার আশিষ লাভ করতে পারে।

মহাপুরুষ।

অতএব তাঁর পুস্তকাদী পড়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। ইংরেজী ভাষাভাষি বা অন্যান্য দেশে যারা উর্দূ জানেন না, তাদের প্রত্যেকের উচিত, যতটুকুই বই-পুস্তক রয়েছে, এগুলো পড়ে নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা। আর আল্লাহ্ তালার ফজলে বিভিন্ন ভাষায় যে বই-পুস্তক রয়েছে, সেগুলোতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং তাঁকে মান্য করা কেন আবশ্যক- এসব বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে। আর আপত্তিকারীদের আপত্তির উত্তর দিন। আপনারা যদি নিজেরা উত্তর তৈরি করেন, তাহলে আপনাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি হবে এবং আপত্তিও উঠবে আপত্তির উত্তরও তৈরি হয়ে যাবে।

প্রত্যেকে নিজে তৈরি করা ছাড়াও তাঁর (আ.) আবির্ভাগের উদ্দেশ্য কী এবং তাকে মান্য করা কেন জরুরী, কিভাবে আমরা এ সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যক্তি-পর্যায়ে পৌছাবো- এ বিষয়ে জামা'তের ব্যবস্থাপনাকেও এবং অংগসংগঠনকেও নিজেদের কর্মসূচী তৈরি করা উচিত।

এতক্ষণ আকিদাগত বিষয়ে আমি আলোকপাত করেছি।

এরপর দ্বিতীয় যে বিষয়টি তরবিয়তের জন্য প্রয়োজন তা হলো, জামা'তের সাধারণ সদস্যদের খলীফার সাথে সম্পর্ক। খেলাফতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে আল্লাহ্ তালার ফজলে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-এর মত একটি মাধ্যমও দিয়ে রেখেছেন। তেমনিভাবে alislam.org ওয়েবসাইটও রয়েছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর, যুবকদের, নারী-পুরুষের এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। সেই সাথে জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং অংগসংগঠনকেও এর সাথে সম্পৃক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবানদের একটি বড় সংখ্যা এমন আছেন, যারা এখানে মসজিদে একান্ত চেষ্টা-সাধনা করে এসে খুতবা শুনেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমটিএ-র মাধ্যমেও খুতবা শুনেন, এমনকি নিয়মিত শুনেন, বরং অনেকে এমন আছেন যারা আমাকে লিখেছেন যে, তারা দু'তিনবার শুনেন। কিন্তু এমন একটি সংখ্যাও রয়েছে যারা খুতবা শুনেন না।

এখানে ইউকে-তেও এমন লোক আছেন যারা খুতবা শুনেন না এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখেন না এমনকি কোন কোন অনুষ্ঠানে এরা অংশগ্রহণও করেন না। কোন এক জামা'তে বড় সংখ্যায় লোকেরা জামা'তের শিক্ষা পরিপন্থি কাজ করায় বাধ্য হয়ে তাদের প্রতি কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তদন্ত করা হলে জানা যায়, তাদের মাঝে অধিকাংশই এমন যারা খুতবা শুনে না বা জামা'তের সাথে সক্রিয়ভাবে তাদের সম্পৃক্ততা নেই। আর এরা জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতেও অংশগ্রহণ করে না।

কিন্তু তাদের রক্তে যেহেতু জামা'তের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাই যখন তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল বা সামান্য শাস্তি দেয়া হল, তখন তারা অস্থির হয়ে একান্ত উদ্বেগ ও বেদনার সাথে আমার কাছে ক্ষমার চিঠি লেখা শুরু করল। আমার সাথে সাক্ষাতকালে অনেকে কান্নাকাটিও করছিল। তারা যদি কেবল দুনিয়াদারই হতেন, তাহলে তাদের মাঝে এমন অনুতাপের অবস্থা সৃষ্টি হতো না। অতএব অনেকে এমন আছেন, যারা জাগতিক কাজের কারণে উদাসীন হয়ে যান এবং যখন তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, তখন তারা অনুতপ্তও হন, তওবা ও ইস্তেগফারও করেন এবং পরবর্তীতে জামা'তের সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টাও করেন।

অতএব স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং নেগরাণী রাখাও জামা'তের ব্যবস্থাপনা, সেক্রেটারী, মুরব্বী এবং অংগসংগঠন সকলের দায়িত্ব। খেলাফতের সাথে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করার ব্যাপারে চেষ্টা করুন। তাদের হৃদয়ে খেলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং বিশ্বস্ততাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন, যার উপাদান প্রথম থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। যখন তাদেরকে বুঝানো হয়, তখন তারা আরো স্পষ্টভাবে সামনে আসে। যদি কোন মরিচা পড়েই থাকে, তাহলে তা এর ফলে দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা যখন তাদের বিশ্বস্ততার বহি:প্রকাশ ঘটে, যখন মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তখন এর বহি:প্রকাশ এক প্রবলতার সাথে হয়ে থাকে।

যদি তরবিয়তী বিভাগ প্রতিনিয়ত যুগ-খলীফার সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য বুঝাতে থাকে এবং খুতবা, জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে, তাহলে একদিকে খেলাফতের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠবে, অপরদিকে তরবিয়তের সাথে

সম্পর্কযুক্ত অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

পরবর্তী যে কথাটির দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, জামা'তের সকল সদস্যদের মাঝে চাঁদার গুরুত্ব স্পষ্ট করা। স্মরণ রাখবেন, আর আমি এটি সাধারণত সকল সেক্রেটারী মালকে বলে থাকি যে, সকল সদস্যকে বলুন, চাঁদা কোন ট্যাক্স বা কর নয় বরং এটি সেই সমস্ত ফরজ কাজগুলোর একটি, যেগুলো আদায়ের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। একস্থানে আল্লাহ তা'লা বলেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

অতএব তোমার সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। এবং শোন ও আনুগত্য কর এবং খরচ কর, কেননা এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যে নিজেকে কৃপনতা থেকে রক্ষা করে, এরাই এমন লোক যারা সফলকাম হবে।

তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম-ঋণ দান কর, তাহলে তিনি তা তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিবেন। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ্ পরম গুণগ্রাহী ও পরম সহিষ্ণু। (সূরা তাগাবুন : ১৭ ও ১৮)

অতএব এসব আয়াত হতে স্পষ্ট, খোদার পথে খরচ করা একজন মোমেনের জন্য একান্ত আবশ্যক একটি বিষয়। যারা খোদার রাস্তায় খরচ করেন, তারাই সফলকাম হবেন। আর বলেন, খোদার রাস্তায় তোমাদের খরচ করা এমন যেন তোমরা আল্লাহ্‌কে কোন ঋণ দিয়েছ এবং আল্লাহ তালা সেই সত্তা, যিনি বান্দাকে তার কুরবানীর প্রতিদানে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। এমন অসংখ্য লোক আমাকে লিখেন, আমরা খোদা তা'লার রাস্তায় চাঁদা দিয়েছি এবং আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকবার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাও করেছি। আল্লাহ তা'লা অমুখাপেক্ষি এবং সর্বনির্ভরস্থল। আমাদের টাকা-কড়ির তার কোন প্রয়োজন নেই। মূলত, আমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, আমাদের আনুগত্যের মান দেখার জন্য, আমাদের তাকওয়ার পথ অন্বেষণ করা প্রত্যক্ষ করার জন্য, আমাদের আর্থিক কুরবানীর দাবীর প্রকৃত মান দেখার জন্য খোদা তা'লা বলেন, তাঁর রাস্তায় খরচ কর, তাঁর ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য খরচ কর।

অতএব এই গুঢ় তত্ত্বটি প্রত্যেক আহমদীর বুঝা উচিত যে, আমরা চাঁদা কেন দেই? যদি কোন সেক্রেটারী মাল বা কোন জামা'তের প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য বা তার জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য চাঁদা দিয়ে থাকে, তাহলে এমন চাঁদা দেয়ার কোন উপকারিতা নেই। বরং না দেয়াই ভাল। যদি অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হয়ে চাঁদা দিয়ে থাকেন, তাহলে এরও কোন লাভ নেই। মোটকথা, যদি চাঁদা দেয়ার উদ্দেশ্য খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কিছু হয়, সেক্ষেত্রে তা খোদা তা'লার কাছে অগ্রহণীয়ও হতে পারে।

অতএব চাঁদা দাতাদের এমন চিন্তা রাখা উচিত যে, তারা চাঁদা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, এটি তাদের প্রতি খোদা তা'লার একটি পরম অনুগ্রহ। এমন নয় যে, কোন ব্যক্তির প্রতি বা জামা'তের প্রতি বা আল্লাহ তালার জামা'তের প্রতি তারা চাঁদা দিয়ে অনুগ্রহ করছে। অতএব প্রত্যেক চাঁদা দাতাকে নিজেদের মাঝে এই চিন্তা ধারা রাখতে হবে যে, তারা চাঁদা দিয়ে খোদা তা'লার আশিষের উত্তরাধিকারী হবার চেষ্টা করছেন। ঐশী জামা'তের জন্য আর্থিক কুরবানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই আমি সকল জামা'তকে বলেছি, নও-মোবাঈন এবং শিশু-কিশোরদেরও ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় বেশী বেশী অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টা করুন, এক পয়সা দিয়েও যদি কেউ এতে শামিল হয় হোক, যেন সে অভ্যস্ত হয় এবং আল্লাহ তা'লার আশিষ লাভ করতে পারে।

চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন,

"পৃথিবীতে মানুষ অর্থকে অনেক বেশী ভালোবাসে, আর এ কারণেই স্বপ্নের তাবীরের গ্রন্থে লেখা আছে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে তার কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে, এর অর্থ হলো ধন-সম্পদ। একারণেই প্রকৃত তাকওয়া এবং ঈমান অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'লা বলেছেন, লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন। (সূরা আলে ইমরান : ৯৩)

প্রকৃত পুণ্য তুমি কখনও অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ হতে খরচ না করবে। কেননা খোদার সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা এবং সদাচরণের একটি বড় অংশ অর্থ খরচ করার প্রয়োজন ঘোষণা করে এবং মানুষ ও আল্লাহ্‌র অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা একই জিনিষ যা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। এটি ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় হয় না। মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করলে সে অন্যের মঙ্গল সাধন কীভাবে করবে? অন্যের ভাল করা এবং সহমর্মিতার জন্য ত্যাগ স্বীকার একান্ত আবশ্যক একটি বিষয়। আর 'লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন' আয়াত সেই ত্যাগ স্বীকারের দিকেই নির্দেশ করছে।

অতএব আল্লাহ তা'লার রাস্তায় অর্থ খরচ করাও মানুষের সৌভাগ্য এবং তার তাকওয়াশীল হবার বৈশিষ্ট ও লক্ষণ সাব্যস্ত করে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনে আল্লাহর জন্য উৎসর্গের গুণ ও মান এমন ছিল, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি প্রয়োজনের উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি বাসার সব জিনিষ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।" (মলফুযাত : ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৩৬৭-৩৬৮, ২০০৩ সালে রাবওয়া থেকে পুণ:মুদ্রিত)

অতএব সেক্রেটারী মালের প্রয়োজন এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তরবিয়ত করা যে, মালি কুরবানী করলে তাকওয়া ও ঈমান সুদৃঢ়

হয়। তেমনিভাবে মুরব্বীদেরও উচিত, যখনই সুযোগ পাবেন এ বিষয়ে নসীহত করবেন। এর জন্য অব্যাহতভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাই সেক্রেটারী মালকে সর্বস্তরে সক্রিয় হতে হবে। সেক্রেটারী মালের কাজ হলো নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা এবং নিজের দৌরাত্ম যেন ব্যক্তিপর্যায়ে থাকে। সাহায্য করার জন্য অংগসংগঠনের কাঁধে পুরো দায়িত দিয়ে দেয়া উচিত নয়। অংগসংগঠন কেবল এতটুকু সহযোগিতা করবে, তারা নিজ নিজ সদস্যদেরকে এ বিষয়ে বুঝাতে থাকবে, এর চেয়ে বাড়তি সহযোগিতা অংগসংগঠনের কাজ নয়। অংগসংগঠন তাদের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে, তারা যেন সেক্রেটারী মালের সাথে সহযোগিতা করে। আর চাঁদার মূল উদ্দেশ্যকে বুঝান।

মোটকথা, চাঁদার গুরুত্ব বুঝানো অঙ্গসংগঠনগুলোর কাজ। কিন্তু সেক্রেটারী মালরা এই বলে এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন না যে, আমরা অংগ সংগঠনগুলোকে বলেছি, কিন্তু তারা আমাদেরকে কোন সহযোগিতা করে নি। এ দায়িত্ব তাদের, আর এটিকে তাদেরই পালন করতে হবে। সেক্রেটারী মালদের কাজ হলো, তারা যেন প্রতিটি স্থানীয় পর্যায়ে এবং ঘরে পৌঁছার চেষ্টা করে।

এখন তো অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, ফোন রয়েছে এবং অন্যান্য মাধ্যমও রয়েছে। বাহনের সুযোগ সুবিধা ইউরোপে অনেক বেশি। পাকিস্তানে এমন এমন সেক্রেটারী মালও ছিলেন, যারা সারা দিন কাজ করতেন। সন্ধ্যা অথবা রাতে যখনই তাদের কাজ শেষ হতো, এরপর তারা ঘরে ঘরে যেতেন, যেমন বড় বড় শহর করাচি লাহোরে তারা সাইকেলে আরোহন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন আর নসিহত করতেন। আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। কিন্তু এখানে আপনারা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন, তার পরও আপনারা কাজ করছেন না। বরং অনেক সেক্রটারী মালের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, তার নিজের চাঁদার বাজেটই মানসম্মত নয়। নিজের চাঁদার বাজেটই যদি সঠিক না হয়, তাহলে অন্যকে সে কীভাবে উপদেশ দিবে। এই কাজ প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে করতে হয়। মালী কুরবাণীর গুরুত্ব বুঝাতে হবে। অনেকেই মন্দ আচরণ করেন। এক্ষেত্রে একবার অস্বিকার করলে দ্বিতীয় বার যান। তৃতীয়বার যান, চতুর্থবার যান। কিন্তু বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কোন ব্যক্তির এমন মনে করা উচিত নয়, তার চাঁদায় জামা'ত চলে আর এজন্য সেক্রেটারী মাল বার বার আসেন।

চাঁদার গুরুত্ব বুঝানো অঙ্গসংগঠনগুলোর কাজ। কিন্তু সেক্রেটারী মালরা এই বলে এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন না যে, আমরা অংগ সংগঠনগুলোকে বলেছি, কিন্তু তারা আমাদেরকে কোন সহযোগিতা করে নি। এ দায়িত্ব তাদের, আর এটিকে তাদেরই পালন করতে হবে। সেক্রেটারী মালদের কাজ হলো, তারা যেন প্রতিটি স্থানীয় পর্যায়ে এবং ঘরে পৌঁছার চেষ্টা করে।

এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা, কখনো আর্থিক সংকট হবে না। কাজ চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। হ্যাঁ, তাঁর চিন্তা ছিল, যে অর্থ খরচ হবে, সেটা সঠিকভাবে হবে কি-না। (আল-ওসিয়্যত রূহানী খাযায়েন : ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৯ দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খরচ যথাসম্ভব সঠিক পদ্ধতিতে করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। কোন কোন জায়গায় খোলাহাতে খরচ হয়ে থাকে, সেখানেও দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে। এজন্য জামা'তে অডিটের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর খরচগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা জামা'তের আমীরেরও দায়িত্ব। বিল আসলেই পাশ করতে হবে এটা আবশ্যক নয়। অডিট ব্যবস্থাকে অধিক সক্রিয় রাখুন। এমন ভাবে সক্রিয় রাখুন, তারা যেন স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন। তাদের পূর্ণ-স্বাধীনতার সাথে কাজ করতে দিন। খরচের ব্যাপারে আমি বলে দিচ্ছি, এম টি এ এর ক্ষেত্রে অনেক বড় খরচ করা হয়ে থাকে আর এর জন্য পৃথক তাহরীকও করা হয়ে থাকে, যদিও এখন খরচ এত বেড়ে গেছে যে, শুধু এই অর্থ দিয়ে এমটিএ-এর খরচ নির্বাহ হয় না। জামা'তের অন্যান্য সামগ্রিক বাজেট থেকেও খরচ করা হয়ে থাকে। কেননা সমগ্র বিশ্বের জন্য মোট এমটিএ-এর পাঁচটি স্যাটলাইট কাজ করে যাচ্ছে।

তাই এ দিকেও মনোযোগ বা দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। ইংল্যান্ডের জলসার দ্বিতীয় দিনের আমার বক্তব্য যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকে, তাহলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের টাকা পয়সার কত বরকত দিচ্ছেন। আর

কীভাবে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কাজ কত সম্প্রসারিত হয়েছে আর আল্লাহ তা'লা প্রতিবছর কীভাবে এই টাকায় বাড়তি ফল এনে দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তা'লার ফজলে এই সমস্ত খরচ সদস্যদের আর্থিক কুরবানী দ্বারাই নির্বাহ করা হয়।

এ ছাড়া আজ আমি আরও কিছু জামা'তী বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, যুগ খলিফার খুতবা শোনাও অতি আবশ্যকীয় বিষয়। অথবা বিভিন্ন সময়ে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়, এগুলো নিয়ে ভাবা এবং নোট করা আবশ্যকীয়। যেখানে জামা'তের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেখানে কর্মকর্তারা নিজেরা সেদিকে মনোযোগ দিন। জামা'তের আমীরের এটা কাজ, যদি খুতবাতে কোন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়, এবং যদি তরবিয়ত সংক্রান্ত কোন বিষয় থাকে, তাহলে এটাকে তাৎক্ষণিক নোট করে যেন জামা'তের প্রেসিডেন্টদের সার্কুলার করা হয়।

আর এর ওপর কতটুকু কাজ হচ্ছে এটা যেন নিয়মিতভাবে তদারকি করা হয়। হয়তো অনেক জামা'ত এটা করে থাকে। কিন্তু রিপোর্ট অনুসারে, এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র আমেরিকা জামা'তের আমীর সাহেবই নিয়মিতভাবে নোট করেন, আর খুতবায় যে কথা বলা হয়, যে নির্দেশনা দেয়া হয়, সেটাকে সার্কুলার হিসেবে প্রেরণ করে থাকেন এবং সবার কাছে পৌছান।

বাকিদেরও এর ওপর আমল করা উচিত। ইংল্যান্ড একটি ছোট দেশ এখানে যদি সঠিকভাবে এ বিষয়ে কাজ করা হয়, তাহলে সব জামা'তের মধ্যে তারা সবচেয়ে ভাল ফল লাভ করতে পারে। এছাড়া কেন্দ্র থেকে আমার পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশনা পাঠানো হয়, এক্ষেত্রে আপনাদের কাজ হলো, এগুলোকে দ্রুত জামা'তগুলোতে পৌছানো। এরপর এগুলোকে ফলোআপ করুন, এর ফিডব্যাক নিন।

তেমভাবে রিজিওনাল আমীর বানিয়ে জামা'তের ন্যাশনাল আমীরের এটা ভেবে বসে থাকা উচিত নয় যে, রিজিওনাল আমীররা কাজ করছেন, সব কাজের দায়িত্ব তাদের ওপর- এমন হওয়া উচিত নয়, আর এটি সঠিক পন্থাও নয়। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত যে বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে এসেছে, তা হল দেশীয় কেন্দ্র এবং জামা'তের মধ্যে দুরুত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। বরং এটাও মনে করা হচ্ছে যে আমরা কেন্দ্র পর্যন্ত সরাসরি পৌছতে পারিনা অর্থাৎ দেশীয় কেন্দ্র পর্যন্ত। এই অনুভুতি দূরীভূত করা অবশ্যক। এই জন্য এখানে এবং অন্যান্য জায়গাতে জামা'তের আমীরকে এ বিষয়ের ওপর আমল করা উচিত, যাতে বছরে দুইবার প্রেসিডেন্টদের সাথে মিটিং হয় এবং তাদের কাজের অগ্রগতির হিসাব নেওয়া হয়। আর যেসব প্রেসিডেন্ট দৃষ্টি আর্কষনের পরও কাজ করেননি, তাদের রিপোর্ট আমাকে পাঠান।

যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, যুগ খলিফার খুতবা শোনাও অতি আবশ্যকীয় বিষয়। অথবা বিভিন্ন সময়ে যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়, এগুলো নিয়ে ভাবা এবং নোট করা আবশ্যকীয়। যেখানে জামা'তের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেখানে কর্মকর্তারা নিজেরা সেদিকে মনোযোগ দিন।

এভাবে সেক্রেটারি মাল, সেক্রেটার তরবিয়ত, সেক্রেটারি তবলীগের সাথে যদি বছরে দুইটি মিটিং না-ও করতে পারেন, তবে একটি মিটিং অবশ্যই করা আবশ্যক এবং তাদের কাজের হিসাব নিন। যদি এই সেক্রেটারিগণ সক্রিয় হয়ে যান, তাহলে অন্যান্য বিভাগগুলোর সেক্রেটারীগণও এবং অন্যান্য বিভাগের সমস্যাগুলো আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

তাই আজ থেকে ন্যাশনাল আমীর এ বিষয়ে নিজের কর্মসূচি তৈরী করুন- কিভাবে প্রত্যেক জামা'তে নিজে পৌঁছে জামাতি ব্যাবস্থাপনাকে সক্রিয় করবেন। ইউকে এবং যেসব ছোট দেশ রয়েছে, তাদের জন্য এগুলো কঠিন কাজ নয়। কেন্দ্রে অথবা যেকোন রিজিয়নে মিটিং এর জন্য একত্রিত করা যেতে পারে। যেগুলো বড় দেশ রয়েছে, যেমন আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি, তারা এ বিষয়ে নিজেদের কর্মপদ্ধতি বানিয়ে নিন, কিভাবে প্রত্যেক স্তরের জামা'তগুলোর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরকে সক্রিয় করবেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে ব্যাপারে পূর্বেও আমি কয়েকবার বলেছি, জামা'তের সদস্যদের সাথে ভালবাসা এবং কোমল ব্যবহার করুন। ইউকে-এর শূরাতে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমি যা বলেছি তা প্রত্যেক কর্মকর্তার নিকট পৌঁছানো উচিত। আর তবশীর বিভাগ এটাকে সব জায়গাতে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিন।

ব্যবস্থপনার ব্যাপারে আমি আরেকটি বিষয় বলতে চাচ্ছি, কর্মকর্তারা যেন তাদের নিজ নিজ বিভাগের ধারাগুলো অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। আইন-কানুনের ব্যাপারে প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদের জানা আবশ্যক তাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি, তাদের ক্ষমতা কতটুকু?

ন্যাশনাল আমীরের জন্য একটি নির্দেশনা হলো, তিনি বিভাগীয় আমীরকে যে কাজ এবং অধিকার দিবেন, সে বিষয়ে যেন কেন্দ্রকে অবহিত করেন। আমার মনে হয় কোথাও এ ক্ষেত্রে কোন কাজ হচ্ছে না।

কেননা এখন পর্যন্ত কোন স্থান থেকে এমন কোন চিঠি আসে নি যে, আমরা উমুক বিভাগে আমীর নিযুক্ত করেছি এবং তাকে ওমুক ওমুক দায়িত্ব দিয়েছি। ধারা নম্বর ১৭৭-এ স্পষ্টভাবে লেখা আছে, এখন এর খুবই প্রয়োজন। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আমীরগণ অবশ্যই নীতিমালার বই থেকে ধারা নম্বর ২১৫ থেকে ২২০ পর্যন্ত পড়ুন এবং এগুলোকে নিজেদের মাথায় রাখুন আর এতে আমল করুন, বিশেষভাবে যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার হয়। (তাহরীকে জাদীদের বিধি-বিধানের ২০০৮ সংস্করনের ২৫৯-২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

এখানে আমি মুবাল্লেগদেরও স্মরণ করাতে চাই, আপনাদেরও উচিত নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। আপনাদের দায়িত্বাবলীর মাঝে জামা'তে কুরআন পড়ানোর ব্যবস্থা করাও একটি দায়িত্ব। আপনারা যদি কোন সফরে যান, সেক্ষেত্রে এমন শিক্ষক তৈরি করুন, যারা শিশু-কিশোরদেরকে এবং যারা কুরআন নাযেরা জানেন না তাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতে পারেন। আর এটি নিয়মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন হলো- এমন যেন না হয়। মাগরিব বা এশার সময় যখনই সময় পান পড়ান। আর যদি মুরব্বী ও মুবাল্লেগগণ সফরে না থাকেন, তিনি যদি নিজ সেন্টারে উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি তার সেন্টারে ক্লাস নিবেন। এ বিষয়ে অনেক অভিযোগ আসছে যে, আমাদের শিশু-কিশোরদের কুরআন পড়ানোর কেউ নেই, তাই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে কখনও কখনও অ-আহমদীদের কাছে যেতে হচ্ছে। তেমনিভাবে যাদেরকে কায়দা পড়ানো প্রয়োজন, তাদেরকে কায়দা পড়ান। এভাবেও ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে মসজিদের সাথে সেই সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবেন। আর এটি তরবিয়তের ক্ষেত্রে অনেক উপকারী সাব্যস্ত হবে।

আর কুরআন করীম পড়ানোর যে উপকার আছে, তা তো আছেই, এটি তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুবাল্লেগদের এটিও স্মরণ রাখতে হবে, সাধারণত তিন চার বছর পর পর সে দেশেই, যেখানে সে অবস্থান করছে, তাদের বদলি হয় আর প্রয়োজন হলে এর আগেও বদলি হয়ে যায়। এমন হলেও অনেক সময় কোন কোন দেশ থেকে অভিযোগ আসে, খুবই ইতস্ততবোধ করেন, এমন বদলিকে আনন্দের সাথে মেনে নেয়া উচিত। আল্লাহ তা'লার ফজলে এখানে ইউকের মুবাল্লেগদের মাঝে এমন বিষয় নেই, এখন পর্যন্ত আমার কানে পৌঁছায়নি।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখতে হবে, কোন কর্মকর্তা বা আমীরকেও যদি কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন হয়, যেমন যদি কোন এমন বিষয় থাকে যা জামা'তের নীতি পরিপন্থি বা যাতে কোন শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হয়, এক্ষেত্রে শিষ্টাচারের গন্ডিতে থেকে বিনয়ের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করান। যদি এর পরও কথা না শুনেন আর জামা'তের ক্ষতি হতে থাকে, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হয়, সেক্ষেত্রে আমাকে অবগত করুন। নিজেদের মাঝে কোন ধরনের বাক-বিতন্ডা করার প্রয়োজন নেই।

কেননা এটি আবার জামা'তের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির কারণ হয়। একবার নিশ্চয় আমি বলেছিলাম, মুরব্বীগণ ধর্মীয় বিষয়ে আমীরগণকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারেন। কিন্তু এর জন্য এই নীতির অনুসরণ করাও আবশ্যক বা এমন নৈতিকতাও অবলম্বন করা আবশ্যক যে, কোনরূপ পরিবেশ নষ্ট না করে বা জামা'তের শৃঙ্খলা নষ্ট না করে উত্তম পন্থায় নসীহত করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত আহমদী হবার এবং নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

এখন জুমুআর নামাযের পর আযীযা তানিয়া খান সাহেবার গায়েবে জানাযাও পড়াবো। ইনি কানাডার উমরে খারেজা আসেফ খান সাহেবের স্ত্রী। তিনি ৬ আগষ্ট ২০১৩ সালে ৩৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

ইনি লুবনানী নাঝাদ কানাডিয়ান মহিলা। ১৯৯৮ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। খুবই ভাল দাঈ ইলাল্লাহ ছিলেন। তবলীগের বিষয়ে বেশ আগ্রহ রাখতেন। লাজনা ইমাইল্লাহ কানাডার সেক্রেটারী তবলীগ ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জামা'তের খেদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন।

কানাডার এমটিএ-এর নিয়মিত সদস্যা ছিলেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমেও ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৌছানোর ক্ষেত্রে সর্বদা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কানাডায় দেশীয় পর্যায়ে ছোট বড় সফর ছাড়াও আমেরিকাও সফর করেছেন। নিজের ধর্মীয় অবস্থান প্রতিটি স্তরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং প্রভাবশালী ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করতেন। পেশায় তিনি একজন শিক্ষিকা ছিলেন এবং বর্তমানে কিছুদিন হলো তিনি ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। শিক্ষার্থিদের মাঝে মানবতাবোধ তৈরি করার লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি পর্দাশীল এবং খেদমতে খালকের বিষয়ে খুবই সক্রিয় ছিলেন। তিনি তারা অঙ্গপত্যঙ্গও ডোনেট করে দিয়ে রেখেছিলেন।

অর্থাৎ ওসিয়্যত করে রেখেছিলেন। গরীবদের প্রতি সহমর্মী এবং আদর্শ স্ত্রীও ছিলেন আর আদর্শ মা-ও ছিলেন। প্রতিটি আত্মিয় সম্পর্ক তিনি খুবই সুন্দরভাবে রক্ষা করেছেন। তার বিয়ে পাকিস্তানে হয়েছে, কিন্তু তিনি অসাধারণভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। ইসলামী মূল্যবোধ রাখতেন, খুবই নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তা'লার ফজলে তিনি মুসিয়া ছিলেন। তার তিনটি মেয়ে সবাই ওয়াকফে নও। তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যে অঞ্চলে বা বিভাগে তিনি থাকতেন, সেখানকার প্রধানমন্ত্রিও তার জানাযায় এসেছিলেন। সাংসদরাও এসেছিলেন। কাউন্সিলার মেম্বাররাও এসেছিলেন। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থিসহ অনেক অ-আহমদী তার জানাযায় এসেছিলেন। তিনি খুবই পরিচিত এবং প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছোট বড় সবার কাছে আমি তার প্রংশসা শুনেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে মাগফেরাত দান করুন। তার মর্যাদা উন্নিত করুন এবং তার স্বামী এবং মেয়েদেরকেও ধৈর্য ও অবিচলতা এবং সহনশীলতা দান করুন।

অনুবাদঃ জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

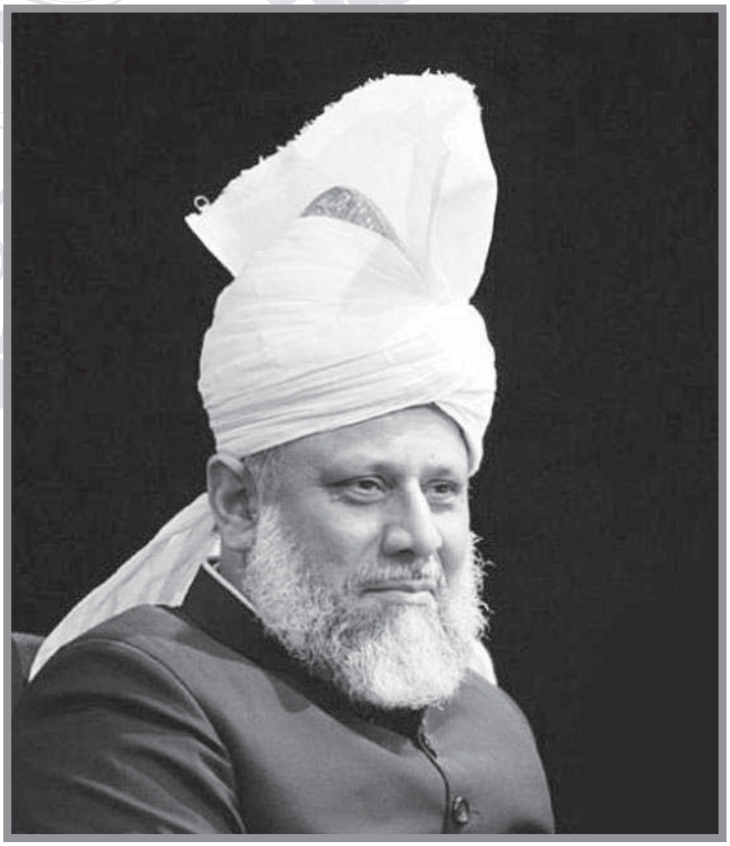

জুমুআর খুতবা

আজ আমাদেরকে যে আতিথেয়তার সুযোগ দেয়া হচ্ছে, তারা কেবলই মেহমান নন বরং একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সফর করে আগমনকারী মেহামন।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ আগষ্ট ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আগত জুমুআ থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে ইনশাআল্লাহ্। জলসা আরম্ভ হওয়ার অনেক পূর্বে জলসার কাজ শুরু হয়ে যায়। যুক্তরাজ্যের জলসা এমন এক জলসা, যেখানে জলসার অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার মধ্যেমে কিছু দিনের জন্য একটি অস্থায়ী শহর তৈরী করা হয়ে থাকে। পাকিস্তানে যে জলসা, সেখানেও লঙ্গরখানার একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা ছিল, কয়েকটি লঙ্গরখানা ছিল। তদ্রুপ আবাসস্থল গুলোও অনেকটা স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে স্কুল এবং কলেজ যখন জামা'তের ছিল, তখন সেগুলো আবাসস্থল হত। কিন্তু যখন সরকার নিয়ে নিল, তখন ভিন্ন আবাসস্থল তৈরী হল। তবে সংখ্যার আধিক্যের কারণে তাঁবু খাঁটিয়েও আবাসস্থল তৈরী করা হত। এছাড়া রাবওয়ার বাসিন্দারা মেহমানদের অনেক বড় একটি সংখ্যাকে নিজেদের ঘরে রাখতেন। তারা যে যে জায়গায় থাকতেন, তাদের খাবার সমূহ লঙ্গরখানা গুলো থেকে দেয়া হত। যাহোক, রাবওয়ার জলসার কতক স্থায়ী ব্যবস্থাপনাও ছিল আর একটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে রাবওয়ার অধিবাসীরাও স্থায়ী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ করুন, তাদের এই উদ্দীপনা এবং তরবিয়তী পরিবেশ আর সেবার আবেগ পূণরায় তাদের জীবনের অংশে পরিণত হোক।

তদ্রুপভাবে এখন কাদিয়ানেও অনেক স্থায়ী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জলসাগাহের ব্যবস্থাপনাই বেশী অস্থায়ী। জলসাগাহ -এরই বেশি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, তথাপি লঙ্গরখানাসমূহে খাবার তৈরীর জন্য, রুটি তৈরীর জন্য অতিরিক্ত শ্রমিক গায়ের আহমদী অথবা গয়ের মুসলিম থেকে নিতে হয়। কিন্তু সেখানেও লঙ্গরের স্থায়ী ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

তদ্রুপ জার্মানিতেও অনেক হলসমূহ পাওয়ার কারণে স্থায়ী ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকে। খাবার তৈরীর ব্যবস্থা করতে হয়। রুটি তারা বাজার থেকে নিয়ে নেন যা টাটকা মনে করে খেয়ে নেয়। তবে আমার ধারণা, সেগুলোও সম্ভবত এক সপ্তাহের পুরনো হয়ে থাকে। যাহোক, যদি না হয়ে থাকে, তাহলে জার্মনির অধিবাসী সংবাদ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনেক দ্রুত। সন্ধ্যা

পর্যন্ত আমি সংবাদ পেয়ে যাবো, টাটকা হয় কিনা।

তদ্রূপ পৃথিবীর অন্য জলসাসমূহের ব্যবস্থাপনার অবস্থা। তবে যুক্তরাজ্যের জলসা, যা খেলাফতের অবস্থানের কারণে এখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। গত বছর পর্যন্ত এটির শুরু থেকে শেষ সকল ব্যবস্থাপনা অস্থায়ী ছিল। পূর্বে ইসলামাবাদে যখন জলসা হত, তখন খাবার তৈরীর জন্য সেখানে স্থায়ী ব্যাবস্থা ছিল। তদ্রুপ সেখানকার নিজেদের রুটির মেশিন ছিল, যা রুটির চাহিদাও কিছুটা পূর্ণ করত। কিন্তু বিগত দুই তিন বছর যাবৎ যখন থেকে জলসা হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে স্থানান্তরিত হল, তখন খাবার এখানে অস্থায়ী লঙ্গরখানায় তৈরী হচ্ছিল। কেননা, এটাই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, ইসলামাবাদ থেকে খাবার আনতে অনেক অসুবিধা হচ্ছিল, তাই কিছু রুটি ইসলামাবাদে তৈরী করা হত, আর কিছু বাজার থেকে কিনে নেয়া হত। এ কারণে অনেক অসুবিধা পোহাতে হচ্ছিল। এ জন্য এখানে কাউন্সিলের সাথে এ বিষয়ে চেষ্টা চলছিল যেন আমাদেরকে হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে স্থায়ী পাকশালা তৈরীর অনুমতি দেয়া হয়, কেননা তাঁবু খাঁটিয়ে যে অস্থায়ী পাকশালা তৈরী করা হত, তা বড় কষ্টকরও, আর কতক দিক থেকে বিপদজনকও।

যাহোক, কাউন্সিল এ বছর দয়া করেছে আর সেখান স্থায়ী কিচেনের অনুমতি পাওয়া গেছে। সেখানে স্টোরের জন্য যে ছাউনি সমূহ তৈরী করা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি বড় ছাউনিকে ভালভাবে ভিতর ও বাহির থেকে ঠিক করে লঙ্গরের স্থায়ী পাকশালা তৈরী হয়েছে। যেখানে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এখন প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার পাকানোর আশা রয়েছে। তথাপি রুটির বিষয়টি ছিল, আমি যখন এখানকার ব্যবস্থাপনাকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই, তখন আমীর সাহেব ও অন্যান্যদের এটিই ধারণা ছিল যে যেভাবে পূর্বে বাজার থেকে রুটি কেনা হত অথবা ইসলামাবাদ থেকে কিছু তৈরী করে নিয়ে আসা হত সেটিই হোক। আমি তাদেরকে বলি নতুন মেশিন স্থাপন করুন, কিন্তু তারা খরচের ভয়ে সতর্ক ছিলেন। যাহোক, আমি যখন তাদেরকে বলি, কেন্দ্র আপনাদের ঋণ দিয়ে দিবে, তখন তাদের কিছুটা আত্মাভিমান চলে আসে আর তারা খরচ করে নেয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে লেবানন থেকে রুটির প্ল্যান্ট আনানো হয়, আমাদের পাকিস্তানের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু লেবানন গিয়ে এই মেশিন ক্রয় করেন আর এখানে এসে স্থাপনও করে দেন, এখনও সময় দিয়ে যাচ্ছেন। কাদিয়ান ও রাবওয়ায় তার মেশিন স্থাপনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই অত্যন্ত উত্তমভাবে এখানে এ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

এখন লঙ্গরের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জলসার ব্যবস্থাপনায়ও রুটি তৈরীর জন্য ও খাবার পাকানোর জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে গেছে। যাহোক, আমরা কাউন্সিলের নিকটও কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এ অনুমতির জন্য প্রতিদান দান করুন। তথাপি এখনও প্রায় ৩০ হাজার লোকের ব্যবস্থার জন্য অনেক অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা তৈরীর প্রয়োজনে পৃথিবীর অন্যান্য জলসার ন্যায় এ জলসায়ও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট কায়েম আছে। বিশেষ করে যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে আবাসন এবং রাস্তার বেশ অসুবিধা হয়, রাস্তার বিষয়টি তো এক পর্যায় পর্যন্ত ট্রেক বিছিয়ে সমাধান করে নেয়া হয়, কিন্তু তাঁবু খাঁটিয়ে অথবা ছোট মার্কি লাগিয়ে আবাসনের ব্যবস্থা ও খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অসুবিধা সমূহ এখনও রয়ে গেছে। যাহোক, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এক সময় আসবে, যখন এই অসুবিধাসমূহেরও সমাধান হয়ে যাবে। আর সেইদিন দূরে নয়, যখন এই অস্থায়ী শহরই জামা'তে আহমদীয়ার স্থায়ী শহরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

যেভাবে আমি বলেছি, শহর আবাদ করার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এই অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার অনেক বড় ব্যবস্থাপনা আর বড় কাজ খোদ্দাম, সাস্থ্যবান আনসার সেচ্ছাসেবকগণ ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে করে থাকেন। গত জুমুয়ায় হঠাৎ করে আমি হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে যাই, তখন সেখানে রুটির প্ল্যান্ট বসানোর পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যস্ত সেই লোকেরা ছাড়া যুবক, শিশু এবং বড়রাও নিজেদের কাজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর জলসার ব্যবস্থাপনা সমূহ উত্তমভাবে সম্পন্নের জন্য ২, ৩ সপ্তাহ পূর্ব থেকেই চেষ্টা করছিলেন। এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, রুটির প্ল্যান্ট বসানোর কাজও বাহির থেকে আগত কোন কোম্পানি করেনি বরং সমস্ত কাজ আমাদের স্বেচ্ছাসেবক, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশায়ান এবং অন্যান্য কর্মীরা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে প্রতিদান দান করুন।

এখানকার স্টান্ডার্ডও এমন যে সেগুলো বাস্তবায়ন করাও আবশ্যক। ভারত, পাকিস্তানের ন্যায় নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা কাজ করে নিলাম আর কোন চেকিং নেই, অস্থায়ী কাজ করে নিলাম, তার ঝুলে আছে তো আছেই অথবা কতক আরো নীতিগত বিষয়াদী রয়েছে। এখানে প্রতিপদে চেকিং হয়ে থাকে। সরকারের সংস্থা এখানে এসে দেখে মঞ্জুরী দেয় তো এরপর আপনি পরবর্তী কাজ শুরু করবেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে রুটির প্ল্যান্ট ও পাকশালার যে শর্ত সমূহ ছিল, সেগুলো স্টান্ডার্ড অনুযায়ী পূর্ণ হয়েছে আর অনুমতিও পাওয়া গেছে। যাহোক, বলার উদ্দেশ্য হল এই, এখানকার অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা সমূহের জন্য অন্য জায়গার তুলনায় বেশি পরিশ্রম করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদী স্বেচ্ছাসেবকগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে নিজেদের কাজ করেন। জামা'তের জন্য সময় ব্যয় করার-এ স্পৃহা আহমদীদের বিশেষ চিহ্ন হয়ে আছে।

প্রত্যেক বিষয়ে আহমদীগণ নিজেদের কুরবানী উপস্থাপন করছেন, ইঞ্জিনিয়ার-এসোসিয়েশন নিজেদের কাজ করে যাচ্ছেন, ডাক্তারস এসোসিয়েশন তাদের কাজ করে যাচ্ছেন, অন্য বিভাগসমূহের লোকেরাও নিজের সময় দিচ্ছেন। জলসার কাজ ছাড়াও সারা বছর এ কাজ জারি থাকে। আহমদীয়া জামা'তের এটি একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে স্বেচ্ছাশ্রমের কাজ অনেক বেশি হয়ে থাকে। বছরের পর বছর তরবীয়তের কারণে জলসার মেহমানদের সেবা আহমদীয়া বিশ্বে একজন আহমদীর অনন্য বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা সকলে জলসার দিনগুলোতে সেবার আবেগেপূর্ণ থাকেন। আর তাদের দায়িত্বে যে কর্তব্যই নির্ধারিত হয় সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত আবেগের সাথে

তৈরী থাকেন আর এমনটিই হওয়া উচিত। কেননা জলসার মেহমান হচ্ছেন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমান। বস্তুতঃ এই আতিথেয়তা উত্তম চারিত্রিক গুণও আর ধর্মও।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তার মান কি ছিল? এটিও এখানে স্পষ্ট করে দিচ্ছি, যেন আমাদের মান আরো উত্তম ও উন্নত হয়। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শারিরীক অবস্থা ভাল ছিল না, তিনি আরাম করছিলেন। একজন মেহমান আসলেন। তাকে সংবাদ দেয়া হলে তিনি (আ.) বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, 'আমি চিন্তা করলাম যে মেহমান কষ্ট করে এসেছে তার অধিকার রয়েছে, তাই আমি এ দায়িত্ব পালনের জন্য বেরিয়ে এসেছি।' (মলফুযাত পঞ্চম খন্ড পৃষ্ঠা-১৬৩, মুদ্রন রাবোয়াহ্ ২০০৩ এডিশন)

অতএব আজও আমাদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদের জন্য এই মানই প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেননা আজ আমাদেরকে যে আতিথেয়তার সুযোগ দেয়া হচ্ছে, তারা কেবল মেহমান নন বরং একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সফর করে আগমনকারী মেহামন। এ কারণে আসছেন, যেন জলসার তিন দিন আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর কথা শুনতে পারেন। এ জন্য আসছেন, যেন নিজেদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় তরবীয়তের ব্যবস্থা করতে পারেন। এই জন্য আসছেন, যেন নিজেদের মাঝে প্রেমপ্রীতি-ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে সৃষ্টি করতে পারেন। অনেক মেহমান এমনও আছেন, যারা অনেক কষ্ট করে এসে থাকেন। কতক নিজেদের ঘরে অনেক ভাল অবস্থায় বসবাসকারীগণ এখানে এসে থাকেন। অথচ এ দিনগুলোতে এখানে জাগতিক ভোগবিলাসের দিক থেকে বেশ কষ্টে চলতে হয়, তা সত্ত্বেও আসেন। কতক গরীব মেহমান নিজেদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দূর-দূরান্তের দেশ সমূহ থেকে কেবল জলসার কল্যাণ সমূহ লাভ করার জন্য এসে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আওয়াজে লাব্বায়েক বলে এসে থাকেন। খলীফায়ে ওয়াক্ত এর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর কথা শোনার আবেগে এসে থাকেন। নি:সন্দহে বর্তমানে এমটিএ আহমদীয়া বিশ্বকে অনেক নিকটে করে দিয়েছে, তথাপি জলসার পরিবেশ নিজের একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র প্রভাব রাখে।

সুতরাং আমাদের এটি মনে করা উচিত যে বর্তমানে কোন কষ্ট রয়েছে, যা এই মেহমানগণ সহ্য করছেন। কতক বয়োবৃদ্ধ, যারা বিভিন্ন রোগবালাই সত্ত্বেও কষ্ট সহ্য করেন আর সফর করেন। কতক যেমন আমি বলেছি, নিজের ঘরের আরাম আয়েশকে ছেড়ে ধর্মের খাতিরে সফর করেন, তাঁবুতে ঘুমান আর সাধারণ খাবারকে প্রধান্য দেন। তাই এমন মেহমানদের আমাদের ওপর অনেক অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অধিকাংশ মেহমান এমন যে তারা কেবল জলসার উদ্দেশ্যে আসেন আর এখন তো সফরের খরচাদিও অনেক বেড়ে গেছে, তথাপি খরচ করে থাকেন আর ভ্রুক্ষেপ করেন না। সতরাং এ মেহমানদের এই সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। এরা অত্যন্ত সম্মানিত মেহমান, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মেহমানদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে অন্য একটি জায়গায় বলেন, 'লক্ষ্য কর! অনেক মেহমান এসেছেন, যাদের মধ্য থেকে কতককে তোমরা চিন আর কতককে চিন না। এ জন্য এটি সঙ্গত যে, সবাইকে আবশ্যক সম্মানিত জ্ঞান করে আপ্যায়ণ কর।' তিনি বলেন, 'তোমাদের প্রতি আমার সু-ধারণা আছে যে, তোমরা মেহমানদের আরামের ব্যবস্থা করে থাক। এদের সকলের অনেক সেবা কর।' (মলফুযাত তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-৪৯২, মুদ্রন রাবোয়াহ্ ২০০৩ এডিশন)

অতএব যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -এর মেহমান, আর ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এসেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লাভ যাদের উদ্দেশ্য, তাদের জন্য আমাদের বিশেষ মনযোগের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -এর সু-ধারণার প্রতি মনযোগ ও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আর প্রত্যেক মেহমানের জন্য সেবার আবেগ আমাদের হৃদয়ে থাকা উচিত। এ ছাড়া হৃদয়ে সবসময় এ ধারণা রাখা উচিত যে, মেহমানদের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক কর্মী এবং ডিউটিরতদের হৃদয়ে এটি থাকা উচিত যে, যেখানেই আমাদের ডিউটি রয়েছে, আমরা সেই দায়িত্ব আদায়ের চেষ্টা করব, যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সু-ধারণা পূর্ণ করতে পারি। আমরা যেন এটি বলার অধিকারী হতে পারি, হে খোদার মসীহ্! এবং খোদার রাসূল (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক! আজও আমরা তোমার প্রত্যেক উপদেশের ওপর আমলকারী। আর একজন আহমদী থেকে এটিই আশা করা হয়ে থাকে। একশত বছরের অধিক সময় আমাদেরকে তার সু-ধারণা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি। আজও আমাদের শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলা নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা করতে থাকবেন। তাঁর এই ধারণা এবং ব্যথাকে সর্বদা সম্মুখে রাখা প্রয়োজন, আর আমরা সেটিকে সম্মুখে রেখে চেষ্টা করতে থাকব। তিনি (আ.) বলেন,

'আমার সর্বদা এটি মনে থাকে যে, কোন মেহমানের যেন কষ্ট না হয় বরং সর্বদা এর তাগিদ দিতে থাকি যে, যতটুকু সম্ভব মেহমানকে আরাম পৌঁছানো হয়।' তিনি (আ.) বলেন, 'মেহমানের হৃদয় আয়নার ন্যায় নাজুক হয়ে থাকে, আর সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যায়।' (মলফুযাত তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-২৯২, মুদ্রন রাবোয়াহ্ ২০০৩ এডিশন)

অতএব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। এটি যেন কেবল আমাদের মৌখিক অঙ্গীকার না হয় রবং কার্যকারী দৃষ্টান্ত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলসা হয়ে থাকে, সেখানেও মেহমান এসে থাকেন, তবে এখানে বিশেষভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জাতি জলসায় আসেন। প্রত্যেক জাতি এবং শ্রেণীর মান ভিন্ন হয়ে থাকে, সহ্য ক্ষমতা ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের কর্থাবার্তাও আবেগ প্রকাশের পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে। আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশা ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের প্রাধান্য গুলোও ভিন্ন হয়ে থাকে, এ কারণে প্রত্যেকের সাথে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে আচরণ করা উচিত। এ কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশকে সর্বদা আমাদের সম্মুখে রাখা উচিত। এগুলো যদি সম্মুখে থাকে, তাহলে সব বিষয়াদি সঠিক

এ কারণে আসছেন, যেন জলসার তিন দিন আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর কথা শুনতে পারেন, যেন নিজেদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় তরবীয়তের ব্যবস্থা করতে পারেন, যেন নিজেদের মাঝে প্রেমপ্রীতি-ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের পরিবেশে সৃষ্টি করতে পারেন। অনেক মেহমান এমনও আছেন, যারা অনেক কষ্ট করে এসে থাকেন। কতক নিজেদের ঘরে অনেক ভাল অবস্থায় বসবাসকারীগণ এখানে এসে থাকেন। অথচ এ দিনগুলোতে এখানে জাগতিক ভোগবিলাসের দিক থেকে বেশ কষ্টে চলতে হয়, তা সত্ত্বেও আসেন। কতক গরীব মেহমান নিজেদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দূর-দূরান্তের দেশ সমূহ থেকে কেবল জলসার কল্যাণ সমূহ লাভ করার জন্য এসে থাকেন।

থাকবে। উপদেশটি হচ্ছে 'মেহমানের হৃদয় আয়নার ন্যায় নাজুক হয়ে থাকে, আর সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যায়।'

প্রত্যেক সেবক যদি এই উপদেশকে হৃদয়ে গেঁথে নেয়, তাহলে কদাচিৎ ছোট খাটো যে সমস্যা সৃষ্টি হয় সেটিও সৃষ্টি হবে না। কখনও অভিযোগ আসবে না, কেবল এটি ব্যতিরেকে যার উদ্দেশ্যই দুষ্টামী হয়ে থাকে। তাহলে অবশ্যই সেখানে অনেক সময় কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়। গত বছর মহিলাদের খাবারের দাওয়াতের সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল। একজন মহিলা অতিথি, যিনি অনেক দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, তিনি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এতে কোন কর্মীর ভুল ছিল বা ছিল না সেটির বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করে আমাদের অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত, তাহলেই সংশোধন হতে পারে। এবার তবশীরের পুরুষ ও মহিলা উভয় দিকের মেহমানদের ব্যাপারে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত যে, যেন কারো কষ্ট না হয়। কেননা যাদের আমি উল্লেখ করছি, এরা বিদেশী মেহমান। যেভাবে আমি বলেছি, সকল মেহমানই মেহমানের মর্যাদা রাখে।

যাহোক, এ বিভাগে আমি কিছু পরিবর্তনও এনেছি। এ পরিবর্তন গুলো হচ্ছে ব্যবস্থাপনার। ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করেছি আর বেশির ভাগ ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের প্রতি এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি পুরস্কার যে, অনেক ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে এমন বয়সে উপনীত হয়েছে, যারা নিজেদের কাজকে সামলাতে পারে। কতক জামা'তের স্থায়ী সেবা করে সামলাচ্ছে, আর কতক অস্থায়ী ব্যবস্থাপনাতেও এসে গিয়েছে। আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এ বছর এ মান উন্নত হবে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, কেবল ব্যক্তি পরিবর্তনে, চেহারার পরিবর্তনে উন্নতি আসে না, বরং আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লার ফযল আমাদের সাথে থাকে আর আমরা সেই কাজ করি আর সেভাবে উত্তম রূপে খেদমতকারী হই, যেভাবে খোদা তা'লা আমাদের থেকে চান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার নিকট এর জন্য তৌফিক চান আর এ দোয়াও করুন যেন এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, যাতে ভুল বুঝাবুঝি জন্ম নেয়।

অতিথি আপ্যায়নের বিষয়ে এ বিষয়টিও পরিষ্কার করতে চাই, যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী আর বিশেষভাবে লন্ডনে বসবাসকারী আহমদী এটি মনে রাখবেন, যুক্তরাজ্যের বাহির থেকে আগমনকারী মেহমানগণ তাদেরও মেহমান। বাহির থেকে আগত মেহমানদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার হয়ে থাকে, যদি ভিসা পেয়ে যায়, তাহলে সংখ্যা এর চেয়েও বেশি হয়ে যাবে। এ কারণে এখানকার আহমদীদের মধ্য থেকে কারো কোন ডিউটি থাকুক বা না থাকুক, তাদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যে, বাহির থেকে আগমনকারী প্রত্যেক মেহমান তাদের মেহমান। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী যাদের ডিউটি নেই, তারা যখন জলসায় আসবেন, তখন তারাও মেহমান হবেন, তবে এখানে বসবাসকারী মেহমানগণের যখন কোন বাহির থেকে আগমনকারী মেহমানের সঙ্গে যোগাযোগ হবে, তখন মনে রাখবেন যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী হচ্ছেন মেজবান আর বাহির থেকে আগমনকারীরা হচ্ছেন মেহমান। অথবা এটি মনে করেন যে, যদি কোন বিশেষ অবস্থায় যুক্তরাজ্য থেকে আগত মেহমান আর যুক্তরাজ্যের বাহির থেকে আগমনকারী মেহমানের মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন হয়, তাহলে যুক্তরাজ্যের বাহির থেকে আগমনকারী মেহমানদের প্রথমে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত আর এখানে বসবাসকারীদের অবশ্যই তাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। সুতরাং সর্বদা এটি স্মরণ রাখবেন, আপনারা কতক পরিস্থিতিতে মেহমান হওয়া সত্ত্বেও মেজবান হবেন। এটি কেবল ডিউটি প্রদানকারীদেরই কাজ নয় বরং এই চিন্তাকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন আর এটিকে প্রসারিত করে নিজেদেরকে ত্যাগ স্বীকারকারী বানান। এগুলো যখন বাস্তবায়িত হবে, তখন আমরা একটি সুন্দর সমাজ প্রত্যক্ষ করব।

আমরা যখন কতক হাদিস দেখি, তখন মনে হয় যে মেহমান না হয়ে মেজবান হয়েই থাকি। একটি হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী অতিথি আপ্যায়ণ হচ্ছে মু'মিনের চিহ্ন। একটি হাদিসে এসেছে, মহানবী

(সা.) বলেছেন, যে আল্লাহ্ এবং আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে, তার মেহমানের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উচিত। (সহী বুখারী কিতাবুল আদব বাব একরামুয্ যাইফে ওয়া খিদমাতুহু ইয়য়াহু ইয়য়াহু বেনাফসিহি হাদীদ নাম্বার : ৬১৩৫)

যিনি মেহমানের সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন না, আল্লাহ্ এবং আখেরাত দিবসের ওপর তার ঈমান দুর্বল। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন বারবার আমাদেরকে অতিথি আপ্যায়নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তখন, এটি তাঁর আকা ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআন করীমের নির্দেশের প্রেক্ষিতেই করেছেন, এ কারণে যেন আমরা নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করি।

অতঃপর একটি হাদিসে মহানবী (সা.) নিজের ভাইয়ের সাথে হাস্যোৎফুল্ল ব্যবহারকেও বড়পূণ্য আখ্যা দিয়েছেন। (সহী মুসলিম কিতাবুর বিররে ওয়াস্ সিলাতে ওয়াল আদাবে বাব ইসতেহ্বাব ত্বালাক্বাতুল ওয়াজহে ই'নদাল লিক্বায়ে হাদীস নম্বার : ৬৬৯০)

অতএব জলসার এই তিন দিনে বিভিন্ন পূণ্য করা হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যের সাথে হাস্যোৎফুল্ল ব্যবহারেও অনেক পূণ্য রয়েছে, যার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। মেজবানদেরও এ সুযোগ সৃষ্টি হবে আর মেহমানদেরও এ সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে আমি ডিউটি প্রদানকারী কর্মীদেরকে বলব যে, তারা যেন একে অপরের সাথে যোগাযোগে, কথাবার্তায় আর অনেক সময় ক্লান্তির কারণে মানুষ খিটখিটেও হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও হাস্যোৎফুল্ল ব্যবহার প্রদর্শন করেন। আর অফিসারগণ নিজেদের অধিনস্থদের সাথে হাস্যোৎফুল্ল আচরণ করেন। পূর্বে কর্মীদের জন্য কতক সময় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, কতক বিশেষ স্থান বা কতক বিশেষ খাবার-দাবার বা যেখানে অফিস তৈরী করা হয়েছে, সেখানে কেবল বিশেষ করে অফিসারদের জন্যই ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে। আর সেখান থেকে সাধারণ কর্মীরা যদি পানিও পান করে নিত, তাহলে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যেত। আমাদের মাঝে এ বিষয়গুলো সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। যাহোক, ডিউটির সময় কাজের ক্ষেত্রে যেভাবে আমি বলেছি বিভিন্ন বিষয়াদি সংঘটিত হয়ে যায়, কাজের মাঝে বাক বিতন্ডা হয়ে যায় কিন্তু সর্বদা মনে রাখবেন, আমাদেরকে সব সময় উত্তম-আদর্শ সম্মুখে রাখতে হবে। মেহমানের সাথে তো হাস্যোৎফুল্ল আচরণ করবেনই, যদি নিজেদের মাঝেও উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেন, তাহলে মেহমানদের ওপরও এই সমস্ত পরিবেশে ভাল প্রভাব পড়বে আর পরিবেশও মনোরোম হবে। অ-আহমদী যে মেহমান এসে থাকেন, তাদের ওপরও ভাল পূণ্য-প্রভাব পড়বে আর তদ্রুপ নিজেও নিজের পূণ্যে উন্নতি করতে থাকবেন। হাস্যোৎফুল্ল আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিভাজন হতে থাকবেন।

অতঃপর প্রত্যেক ডিউটি প্রদানকারী কর্মীর একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আতিথেয়তা কোন দয়া নয়, বরং যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ বলেছেন, যার বর্ণনা পূর্বে এসে গিয়েছে, মহানবী (সা.)ও এটিই বলেছেন, এটি মেহমানের অধিকার। আর আল্লাহ্ তা'লা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কি বলেন? এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ওয়া আ'তেযাল কুরবা হাক্কাহু ওয়াল মেসকিনা ওয়াবনাস সাবিলে ওয়ালা তুবাযযির তাবযিরা" (বনী ইসরাঈল : ২৭) আর নিকট-আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং অভাবী ও পথিককেও দান কর, আর অপব্যয় করো না।

এখানে তিন ধরণের লোকের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তবে আজকের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে পথিকের অধিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। পথিকেরও কয়েকটি ধরণ রয়েছে। কিন্তু যারা খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে এবং খোদা তা'লার নির্দেশের প্রেক্ষিতে সফর করেন, তাঁরা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী পথিক।

একটি হাদিসে এসেছে যে, এমন মজলিস, যাতে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রাসূল এর যিকর করা হয় সেই মজলিসে আগমনকারীদের ওপর ফেরেশ্তারাও শান্তি এবং দোয়ার তোহফা প্রেরণ করে থাকেন। (সহী মুসলিম কিতাবুর যিকরে ওয়াদ দোয়ায়ে ..... বাবু ফযলে মাজালেসুয় যিকরে হাদীস নম্বার : ৬৮৩৯) আমাদের জলসাও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এমনই মজলিসের অন্তর্ভুক্ত। আর এই মজলিস সমূহে অংশগ্রহণের নিয়তে সফর করে আগমনকারীর মর্যাদাও অনেক উন্নত। কেননা ফেরেশ্তা তাদের জন্য দোয়া করে যাচ্ছে। সুতরাং সৌভাগ্যশালী সে সকল লোক, যারা এমন মুসাফিরদের সেবা এবং অতিথি আপ্যায়ণের দায়িত্ব পালনকারী, যার অধিকার আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিশ্চিত এগুলোর হক্ আদায়কারীগণ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভকারী হবেন। আর যে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করে নেয়, তার চেয়ে বড় সৌভাগ্যশালী আর কে হতে পারে?

সুতরাং যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, বুঝতে পারবেন যে, জলসাও এক অদ্ভুত ব্যবস্থাপনা। এতে প্রত্যেকের জন্য একটির পর আরেকটি পূণ্যের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। আমি যেমনটি শুরুতে বলেছিলাম, স্পৃহা নিয়ে খেদমত করার বিষয়টি। প্রত্যেক খেদমতকারীর সম্মুখে এটা রাখা উচিত, বুঝা উচিত। যদিও এ আবেগ নিয়ে করেও থাকেন, তথাপি এতে আরো বেশি উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। ডিউটি দান কারীরা যেন কেবল এ কারণে ডিউটি না দেন যে, জামা'তের পক্ষ থেকে কাজে সহায়তা কারীদের সাহায্য করতে বলা হয়েছে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর বলে দিয়েছেন, ওয়াকারে আমল করতে হবে তাই চলে আসুন, লাজনার সদর বলে দিয়েছেন, অনুগ্রহ করে কাজ করার জন্য গ্রুপে এসে শামিল হউন, বরং উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হয়। মহানবী (সা.) -এর সাহাবীরা কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য আতিথেয়তা করেছেন এবং সেটির হক আদায়ে সঠিকভাবে আতিথেয়তা করেছেন -এর একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

এই বর্ণনা আমরা যতবারই শুনি ও পড়ি, এটি নতুন স্বাদ প্রদান করে বা শিক্ষা প্রদান করে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) -এর নিকট একজন মুসাফের আসল। তিনি (সা.) ঘরে খবর পাঠালেন যে, অতিথির জন্য খাবার পাঠাও। উত্তর এলো, আজ ঘরে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। হুযুর (সা.) সাহাবাদেরকে বললেন, এই অতিথির

খাবারের ব্যবস্থা কে করবে? এক আনসার নিবেদন করলেন, হুযুর! আমি ব্যবস্থা করছি। অতঃপর তিনি ঘরে গেলেন এবং তার স্ত্রীকে বললেন, মহানবী (সা.) -এর মেহমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। স্ত্রী উত্তরে বললেন, আজ ঘরে কেবল বাচ্চাদের খাবার আছে। আনসারী সাহাবী বললেন, ঠিক আছে খাবার তৈরি কর অতঃপর আলো জ্বালাও। আর যখন বাচ্চাদের খাবারের সময় আসবে তখন তাদের স্নেহের হাত বুলিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে শুইয়ে দাও। অতএব স্ত্রী খাবার তৈরি করলেন, আলো জ্বেলে দিলেন, বাচ্চাদেরকে অভুক্ত ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, অতঃপর আলো ঠিক করার বাহানায় উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন এবং উভয়ে মেহমানের সাথে বসে এটি প্রকাশ করতে লাগলেন যেন তারাও খাবার খাচ্ছেন। সুতরাং তারা উভয়ে রাতে ক্ষুধার্তই থাকেন। সকালে সেই আনসারী যখন মহানবী (সা.) -এর সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (সা.) হেসে বললেন, তোমাদের রাতের পরিকল্পনায় আল্লাহ্ তা'লাও হেসেছেন। বা তিনি বলেছেন, তোমাদের উভয়ের এ কাজকে তিনি পছন্দ করেছেন। সেই ঘটনাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। "ওয়া ইউ'ছেরূনা আ'লা আনফুসেহিম ওয়া লাও কানা বেহিম খাসাসা ওয়া মাঁইইউক্বা শুহ্‌হা নাফসেহি ফাউলায়েকা হুমুলমুফলেহুন" (সূরা হাশর ১০)

অর্থাৎ এ পবিত্র অন্তকরণ ও নিষ্টাবান ত্যাগী মু'মিন নিজে দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের সত্ত্বার উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়। আর প্রবৃত্তিতে নিহিত কার্পন্য থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়, তারাই সফলতা লাভকারী। (সহী বুখারী কিতাবু মানাক্বেবেল আনসারে বাবু ক্বাওলুল্লাহ্ ওয়া দু'উছেরুলা আ'লা আনফুসেহিম ওয়া লাভ কানা বেহিম খাসাসা হাদীস নাম্বার : ৩৭৯৮)

দেখুন এটি কত বড় কুরবানী, বাচ্চাদেরকে ক্ষুধার্ত ঘুম পাড়িয়ে মেহমানকে খাবার খাইয়েছেন। বর্তমানে আল্লাহ তা'লার ফযলে এমন পরিস্থিতি নেই বললেই চলে এবং বিশেষভাবে জামাতী মেহমানদের জন্য এমন অবস্থা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে একেবারেই নেই। ঐ মেহমান, যাঁর জন্য সেই পরিবার ত্যাগ স্বীকার করেছিল, তিনিও জামা'তী মেহমান ছিলেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আগমনকারী মেহমান ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর খেদমতে আগমনকারী মেহমান, তাঁরই মেহমান ছিলেন। এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে আমাদেরকে মেহমান নেওয়াজীর গুরুত্বের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেই মেহমান, যিনি মহানবী (সা.) -এর মেহমান ছিলেন, তিনি অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আর বর্তমানে তাঁর (সা.) সত্যিকার দাসের যারা মেহমান, তাদেরকেও খোদা তা'লা অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন।

অতএব প্রত্যেক কর্মীকে এই গুরুত্ব সামনে রাখা উচিত। লক্ষ করুন! বাচ্চাদেরকে জোর করে ক্ষুধার্ত রাখা হয়েছে, বাহ্যত এটি অন্যায় মনে হয়। কিন্তু ত্যাগ স্বীকার এবং খেদমতের একটি উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে পুরো পরিবার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। কতক স্ব-ইচ্ছায় আর কতক বাধ্য হয়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সে সব সন্তানদেরও প্রভুত কল্যাণ দান করে থাকবেন। যেমনটি এ আয়াতের বিষয়াবলী থেকে স্পষ্ট। আল্লাহ তা'লা এমন লোকদেরকে 'মুফলেহুন' বা সফলকাম -এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর সফলকাম কারা? আমরা যদি এর অর্থের দিকে তাকাই, তাহলে এর ব্যাপকতা বুঝা যায়। সফলকাম তারাই, যারা ফুলে ফলে সুশোভিত, যারা সফলতা অর্জনকারী, যারা নিজেদের নেক ও উন্নত আকাঙ্খা অর্জনকারী এবং এর ফলশ্রুতিতে আনন্দ লাভকারী, আর প্রত্যেক ধরণের কল্যাণ লাভ কারী, স্থায়ীভাবে এই কল্যাণ ও সফলতায় বসবাস কারী। জীবনের সুখ ও সাচ্ছন্দ লাভ কারী, নিরাপত্তার বেষ্টনীতে সুরক্ষিত। অতএব এক বেলার খাবারের ত্যাগ স্বীকার ও মেহমান নেওয়াজী তাদেরকে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির ভাগীদার বানিয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। যে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির সাথে এসব কিছু পেয়ে যায়, তার আর কী চাই?

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এটি সেই মর্যাদা, যা একজন আতিথেয়তাকারী লাভ করে থাকে। এটি সেই মর্যাদা, যা আমাদেরকে নিজেদের মেহমানদের সেবা করে লাভ করা উচিত। এটি সেই মানদন্ড, যা ইনশাআল্লাহ্ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দান করে ইহ ও পরকালকে সুসজ্জিত করার কারণ হবে।

অতএব আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাদের জন্য মুফলেহীনদের (সফলকামদের) অন্তর্ভূক্ত হবার পথ উন্মুক্ত করছেন। আল্লাহ করুন, সকল সেবক, সকল কর্মী যেন এই কল্যাণ লাভ কারী হতে পারেন এবং জলসার যে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে, আল্লাহ তা'লা সে গুলোকেও সহজ করে দিন।

জুমুআর নামাযের পর আমি একটি গায়েবে জানাযাও পড়াব যা আমাদের একজন শহীদ ভাই মোকার্‌রম যহুর আহমদ কায়ানী সাহেবের। আউরাঙ্গী টাউন করাচিতে ২১ আগষ্ট তাকে শহীদ করা হয়েছে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

তার শাহাদাতের ঘটনা এরূপ, ২১ আগষ্ট সোয়া এগারোটায় যহুর সাহেব তার এক বন্ধুর সাথে ঠিক করতে দেয়া গাড়ি নিয়ে ফিরেন। গাড়ি কিছুটা দূরত্বে ছিল। তিনি যখন গাড়ি চেক করার জন্য বাহিরে আসলেন, ঠিক সেই সময় তার অ-আহমদী প্রতিবেশী নুরুল হক সাহেবও বাইরে বের হলেন, আর এরা তিন জন গাড়ি দেখার জন্য চলে গেলেন। আমি যেমন বলেছি গাড়িটি বাসা থেকে কিছুটা দূরুত্বে রাখা ছিল। এই তিন জন গাড়ি চেক করে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন একটি মটরসাইকেলে দু'জন আক্রমনকারী আসে, যাদের মধ্য থেকে একজন মোটর সাইকেল থেকে নেমে যহুর সাহেবের ওপর এলোপাথারী গুলি বর্ষণ শুরু করে দেয়। যহুর সাহেবের প্রতিবেশী নূরুল হক সাহেব হামলাকারীর হাতে ঝাপটা মারেন, এতে হামলাকারীদের অপর ব্যক্তি নূরুল হক সাহেবের ওপর গুলি করা পালিয়ে যায়। যহুর সাহেবের মেয়ে যখন ফায়ারিং -এর শব্দ শুনে, তখন সে ওপর থেকে জানালা দিয়ে দেখে, দু'টি মোটর সাইকেল ফায়ারিং করতে করতে পালিয়ে যাচ্ছে। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চা পান করছিল, সে চায়ের কাপ হামলাকারীদের উপর ছুড়ে মারে, তারা তার ওপরও গুলি

করে। ঘরের জানালায়ও গুলি লাগে। কিন্তু মেয়েটি বেঁচে যায়। যহুর সাহেব আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ঘটনা স্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

শাহাদাতের সময় মরহুমের বয়স ছিল ৪৭ বছর। তার প্রতিবেশী নূরল হক সাহেব, যিনি গায়ের আহমদী ছিলেন, তিনিও আঘাতের তীব্রতা সহ্য না করতে পেরে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও দয়া ও মাগফেরাতের আচরণ প্রদর্শণ করুন। শহীদ যহুর সাহেবের পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছিল তার চাচা ইউসুফ কিয়ানী সাহেব এবং মোকাররম মোহাম্মদ সাঈদ কিয়ানী সাহেবের মাধ্যমে। তারা দুইজন ১৯৩৬ সালে বয়া'ত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। দু'জনেই জ্ঞানী ছিলেন আর নিয়মিত পড়াশোনা করার পর বয়া'তের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এরপর মরহুম শহীদের পিতা এবং অন্য তিন চাচাও আহমদীয়াতের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যান। তাদের পরিবার প্রেমকোট মুযাফফরাবাদ কাশ্মীরের সাথে সর্ম্পক যুক্ত ছিলেন।

তিনি ১৯৬৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে করাচীতে শিফ্‌ট হন। তিনি সেখানেই বিএ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পরে ফেডারেল বোর্ড অফ রিভিনিউতে চাকরী শুরু করেন। শাহাদাতের সময় কাস্টমস বিভাগের এন্টিস্মাগলিং ইউনিটে ক্লার্ক হিসাবে কাজ করছিলেন। যহুর সাহেব নিজের মজলিসের সাথে অত্যধিক সহযোগীতাকারী ছিলেন। অত্যধিক মিশুক এবং মালী-কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রথম সারির মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তদ্রূপ মেহমান নেওয়াজি তার বিশেষ গুণ ছিল। কখনো ঘরে আগত মেহমানকে আপ্যায়ন করা ছাড়া যেতে দিতেন না। জামাতি প্রত্যেক কর্মকর্তাকে সম্মান করতেন আর কোন ধরনের আভিযোগের সুযোগ দিতেন না। শহীদ মরহুম মূসীও ছিলেন। তদ্রূপ তবলীগেরও আগ্রহ ছিল। ২০০৯ সালে এক ব্যক্তিকে বয়া'ত করানোরও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেন। তার শাহাদাতের পর হাসপাতালে এবং পরে জানাযার স্থলে তার অফিস থেকে ব্যাপক সংখ্যায় লোক এসে শরিক হয়েছে আর প্রত্যেকেই শহীদের উন্নত চরিত্র ও অভ্যাসের প্রশংসা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'লক্ষ্য কর! অনেক মেহমান এসেছেন, যাদের মধ্য থেকে কতককে তোমরা চিন আর কতককে চিন না। এ জন্য এটি সঙ্গঁত যে, সবাইকে আবশ্যক সম্মানিত জ্ঞান করে আপ্যায়ণ কর।' তিনি বলেন, 'তোমাদের প্রতি আমার সু-ধারণা আছে যে, তোমরা মেহমানদের আরামের ব্যবস্থা করে থাক। এদের সকলের অনেক সেবা কর।'

করেছেন। তার এক সাথী, যিনি শাহাদাতের পর তার লাশের সাথে ছিলেন, তিনি কেঁদে কেঁদে শহীদ মরহুমের উল্লেখ করে বলছিলেন, তিনি অত্যন্ত মমতাশীল এবং সন্ধিপ্রিয় ছিলেন। কাজের ক্ষেত্রে কতক সময় আমরা রাগান্বিত হলে তিনি আমাদেরকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিতেন। তার অফিসারগণ বলেছেন, যহুর আহমদ কিয়ানী সাহেব আমাদের একজন অত্যন্ত সাহসী এবং নিষ্ঠাবান সৈনিক ছিলেন। যিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যেককে নিজের প্রেমিক বানিয়ে নিতেন। আজ আমরা একজন ভাল সাথীকে হারিয়েছি।

তার শ্বশুর বশীর কিয়ানী সাহেব বলেন, শহীদ মরহুম তার খানদানের প্রত্যেককেই সাহায্য ও সহযোগীতা করতেন। আর্থিক ভাবে খোদা তা'লা তাকে সাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। একারণে পুরো খানদানে যখনই তাদের কোন প্রয়োজন হতো, তিনি তাদের সাহায্য করতেন। খানদান ছাড়াও অন্য যে কোন ব্যক্তি তার দ্বার থেকে খালি ফিরে যেত না। বাচ্চাদের সাথেও তার অত্যন্ত মমতাশীল আচরণ ছিল। বাচ্চাদের সমস্ত চাহিদার সম্পূর্ণ খেয়াল করতেন, তাদের পড়াশোনার চিন্তায় থাকতেন। গভীরভাবে তাদের তত্ত্বাববধান করতেন। তার স্ত্রী বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে তাকে এত ভাল হৃদয় দিয়েছিলেন, মনে হয় শহীদ হওয়ার জন্যই এত ভাল হৃদয় দিয়েছিলেন। বাচ্চাদেরকে কখনো ধমকাতেন না। তিনি বলেন, শাহাদাতের পূর্বে আমাকে বললে, আমার জুতা পরিস্কার করে দাও, আমি এখনই আসছি। তারপর হেসে নিচে চলে গেলেন। হামলার পরে বাচ্চার সাথে যখন ঘরের বাহিরে এসেছি আর তাকে দেখেছি, তখন তিনি আমাকে এবং বাচ্চাদেরকে আহত অবস্থায়ও মুচকি হেসে দেখছিলেন যেভাবে বিদায় সম্ভাষণ দেয়া হয়। অতঃপর তিনি তার নিজের আত্মা প্রকৃত স্রষ্টার নিকট সোর্পদ করে দেন।

বাচ্চাদেরকে কখনো তিনি কিছু বলতেন না, কিন্তু আমার যে খুতবা এমটিএ-তে আসত, সেটা তিনি বাচ্চাদেরকে সব সময় শুনতে বলতেন। আর মূলত এক্ষেত্রে তিনি অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করতেন যে কেন খুতবা শুননি। তিনি খুবই নিয়মানুবর্তী ছিলেন। মেয়েদের সাথে অত্যন্ত স্নেহ ও মমতার সম্পর্ক ছিল। তিনি তার পিছনে নিজের স্ত্রী তাহেরা যহুর কিয়ানী সাহেবা ছাড়াও তিন পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন। ইমরান কিয়ানী ২০ বছর, কামরান কিয়ানী ১৪ বছর, সরফরাজ ৩ বছর। তদ্রূপ মেয়ে নূরুস্ সাবাহ্ ১৬ বছর, নূরুল আ'ঈন ১৪ বছর, আতিয়াতুল মুজিব ৭ বছর, ফায়েকা যহুর ৫ বছর।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাকে উন্নীত করুন। আর তার বাচ্চাদেরকে তাঁর হেফাযতে রাখুন, তার স্ত্রীকেও তাঁর হেফাযতে রাখুন, তার শোক সহ্য করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

অনুবাদঃ জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

জুমুআর খুতবা
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার মূলনীতি

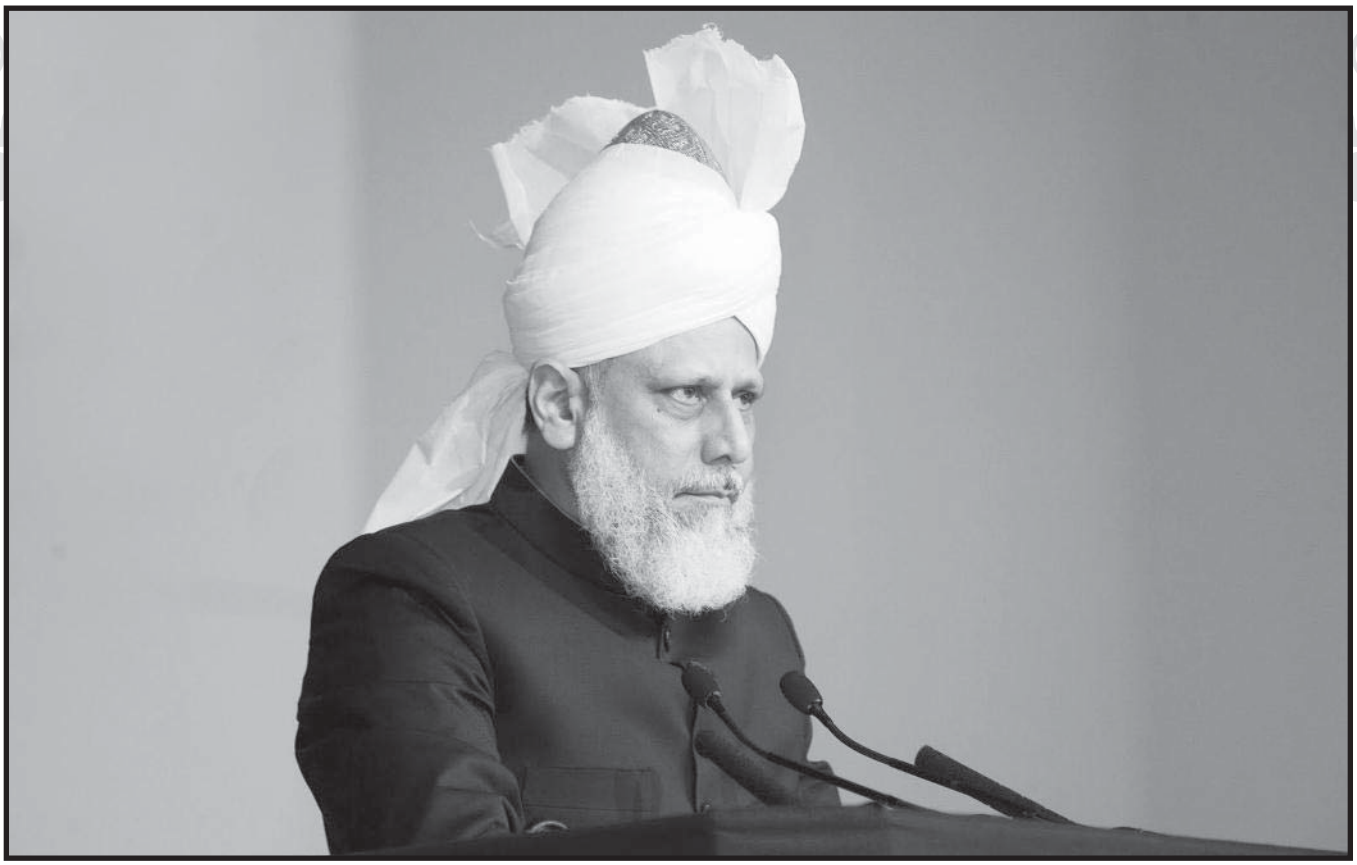

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন,

প্রত্যেকের উচিত খোদা তা'লাকে ভয় করা আর খোদা তা'লার এই ভয় তাকে অনেক নেকীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবে। প্রকৃত অর্থে, ভাল এবং নেক তো সে-ই, যে খোদা তা'লার নিরীক্ষায় ভাল প্রমাণিত হয়। অনেকে রয়েছেন যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করেন এবং মনে করেন যে আমরা মুত্তাকী (খোদাভীরু), কিন্তু প্রকৃত মুত্তাকী হল সে, যার নাম খোদা তা'লার খাতায় মুত্তাকী লেখা হয়েছে। (মালফুযাত, ৩য় খন্ড প্রষ্ঠা ৬২৯-৬৩০, এডিশন ২০০৩, রাবওয়া কর্তৃক প্রকাশিত)

অতএব এটাই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, যদি এটি আমাদের দৃষ্টিপটে থাকে, তাহলে আমরা খোদা তা'লারও হক্ (অধিকার) আদায়কারী হব এবং বান্দারও হক্ (অধিকার) আদায়কারী হব। কিন্তু আমরা যদি নিজেদেরকে ইবাদতকারী এবং খোদার অধিকার আদায়কারী মনে করি এবং এই সকল কাজে কোন ধরনের কৃত্রিমতা বা লোক-

প্রত্যেকের উচিত খোদা তা'লাকে ভয় করা আর খোদা তা'লার এই ভয় তাকে অনেক নেকীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবে। প্রকৃত অর্থে, ভাল এবং নেক তো সে-ই, যে খোদা তা'লার নিরীক্ষায় ভাল প্রমাণিত হয়। অনেকে রয়েছেন যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করেন এবং মনে করেন যে আমরা মুত্তাকী (খোদাভীরু), কিন্তু প্রকৃত মুত্তাকী হল সে, যার নাম খোদা তা'লার খাতায় মুত্তাকী লেখা হয়েছে।

দেখানো ভাব থাকে, অথবা আমরা যদি শুধু ইবাদত করি আর খোদা তা'লার সৃষ্টির অধিকার আদায় না করি, তাহলে এমন সব ইবাদতও খোদা তা'লার দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়। এগুলো মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানায় না, যা কিনা একজন মানুষের ইবাদতের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখন আমি আপনাদের সামনে একটি দীর্ঘ বর্ণনা উপস্থাপন করব, যা একটি নসিহত বা ওসীয়্যতের মত আঁ হযরত (সা.) হযরত মুআয (রা.) কে করেছিলেন।

আঁ হযরত (সা.) একদিন হযরত মুআয (রা.)কে বললেন–"ইয়া মুআযু ইন্নী মুহাদ্দেসুকা বেহাদীসীন ইন আনতা হাফাযতাহু নাফাআকা।"

অর্থাৎ হে মুআয আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, যদি তুমি তা স্মরণ রাখ, তাহলে তা তোমাকে লাভবান করবে। আর যদি তুমি তা ভুলে যাও, তাহলে তুমি আল্লাহ্ তা'লার ফযল অর্জন করতে পারবে না। আর তোমার কাছে নাজাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মত কোন দলিল অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! আল্লাহ্ তা'লা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে সাতজন দারোয়ান ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ রূহানী (আধ্যাত্মিক) উচ্চতায় পৌঁছানোর সাতটি স্তর রয়েছে এবং তদনুযায়ী মানুষ সেখানে পৌঁছে থাকে। আর সেই ফেরেশ্‌তাদের এক একজনকে প্রত্যেক আকাশে যাওয়ার জন্য 'রাওয়াব' অর্থাৎ দারোয়ান হিসেবে নির্ধারণ করে দিলেন। তাদের দায়িত্ব হল, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক এবং শুধুমাত্র সেই সকল লোককে এদিক দিয়ে অতিক্রম করতে দিবে, যাদের অতিক্রমের অনুমতি আমি দেই।

নবী করীম (সা.) বলেন, সে সকল ফেরেশ্‌তা, যারা মানুষের আমলের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তাদের দৈনন্দিন আমলনামা লিখে থাকে, খোদার এক বান্দার আমলসমূহ নিয়ে, যা সেই বান্দা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত করেছিল, আকাশের দিকে উঠতে লাগল এবং তার আমলসমূহকে সেই ফেরেশ্‌তারা পবিত্র মনে করেছিল। তারা ভেবেছিল, এগুলোতো অনেক ভাল আমল এবং সেগুলোকে অর্থাৎ আমলসমূহকে তারা বেশী পবিত্র মনে করেছিল। কিন্তু যখন তারা আমলসমূহ নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছল, তখন সেই দরজার দারোয়ান ফেরেশ্‌তাকে তারা বলল, আমরা খোদা তা'লার কাছে এক বান্দার আমলসমূহ উপস্থাপন করতে এসেছি। এসব আমল অনেক পবিত্র। তখন সেই দারোয়ান ফেরেশ্‌তা বলল, থাম তোমাদের সামনে যাওয়ার অনুমতি নেই। তোমরা ফিরে যাও এবং এই আমলগুলোকে ঐ ব্যক্তির মুখের ওপর ছুড়ে মার। সেই দারোয়ান বলল, খোদা তা'লা আমাকে এই আদেশ দিয়ে এখানে দাঁড় করিয়েছেন যে, আমি যেন কোন গীবতকারী বান্দার আমলকে এই দরজা দিয়ে অতিক্রম হতে না দেই। এই ব্যক্তি, যার আমল খোদা তা'লার নিকট উপস্থাপন করার জন্য তোমরা নিয়ে এসেছ, সে তো সর্বদা গীবত করে বেড়ায়। লোকজনের অনুপস্থিতিতে তাদের কথা বলে বেড়ায়। এরপর রসূলে করীম (সা.) বলেন, আরও কতিপয় ফেরেশ্‌তা অপর এক বান্দার আমল সমূহ নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। সেই ফেরেশ্‌তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে এই আমলগুলো অনেক পবিত্র এবং এই বান্দা এই আমলগুলো অনেক বেশী পরিমাণে করে থাকে। আর যেহেতু এই আমলগুলোতে গীবতের কোন মিশ্রণ ছিল না, তাই প্রথম আকাশের দারোয়ান তাদেরকে যেতে দিল। কিন্তু তারা যখন ২য় আকাশে পৌঁছাল, তখন সেই জায়গার ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে বলল, থাম। ফিরে যাও এবং এই আমলগুলোকে তাদের কর্তার মুখে ছুড়ে মার। সেই ফেরেশ্‌তা বলল, আমি গর্বের ফেরেশ্‌তা এবং খোদা তা'লা আমাকে এই জন্য এখানে নিযুক্ত করেছেন যেন আমি কোন বান্দার এমন কোন আমলকে এদিক দিয়ে অতিক্রান্ত হতে না দেই, যার মাঝে গর্বের কোন অংশ আছে এবং যে নিজ সভায় বসে বড় গর্বের সাথে নিজের নেকীর বর্ণনা করে থাকে। এই ব্যক্তি, যার আমলসমূহ তোমরা নিয়ে এসেছ, মানুষের সভাসমূহে বসে নিজ

আমলের ওপর গর্ব করে। অত:পর আঁ হযরত (সা.) বলেন ফেরেশ্‌তাদের অপর একটি দল আর একজন বান্দার আমল নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হল। আর সেই ফেরেশ্‌তাদের দৃষ্টিতে সেগুলো ছিল পরিপূর্ণ নূর এবং এমন আমল যা অত্যন্ত উজ্জ্বল। সেই আমলসমূহের মাঝে দান-খয়রাতও ছিল, রোযাও ছিল, নামাযও ছিল এবং সেই ফেরেশ্‌তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, খোদা তা'লার এই বান্দা কিভাবে নিজ প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য পরিশ্রম করছে। আর যেহেতু এই আমলগুলোর মাঝে গীবতেরও কোন অংশ ছিল না এবং অহংকারেরও কোন সংমিশ্রণ ছিলনা, তাই প্রথম ও দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশ্‌তারা তাদের অতিক্রম করতে দিল। কিন্তু তারা যখন তৃতীয় আকাশের দরজায় পৌঁছল, তখন তার দারোয়ান-ফেরেশ্‌তা বলল, থাম–

"ইযরিবু বে হাযাল আমলে ওয়াজহা সাহেবিহী"

অর্থাৎ- তোমরা খোদা তা'লার কাছে যে ব্যক্তির আমলসমূহ উপস্থাপন করতে যাচ্ছ, সেই ব্যক্তির কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাও আর এগুলোকে তার মুখের ওপর ছুড়ে মার। সেই ফেরেশ্‌তা বলল, আমি অহংকারের ফেরেশ্‌তা আর আমাকে খোদা তা'লা তৃতীয় আকাশের দরজায় এই আদেশ দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন যে, এই দরজা দিয়ে যেন এমন কোন লোকের আমল অতিক্রম করতে না পারে, যার মাঝে অহংকারের কোন অংশ বিদ্যমান। এই ব্যক্তি, যার আমল তোমরা নিজের সাথে নিয়ে এসেছ, এ তো বড়ই অহংকারী। সে নিজেকেই সবকিছু মনে করে। এবং অন্যদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে ও তাদের সাথে অহংকারের আচরণ করে থাকে। আর নিজ সভাসমূহে ঘাড় উঁচু করে বসে। তার আমলসমূহ তোমাদের দৃষ্টিতে ভাল মনে হচ্ছে, কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তা গ্রহনীয় নয়।

অত:পর আঁ হযরত (সা.) বলেন, চতুর্থ একটি দল অপর এক বান্দার আমলসমূহ নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হল। সেই আমলগুলোকে সেই ফেরেশ্‌তাদের কাছে 'কাওকাবুন দুররিউন' অর্থাৎ উজ্জল তারার মত মনে হচ্ছিল। সেই আমলসমূহের মাঝে নামাযও ছিল, তাসবীহও ছিল, হজ্জও ছিল, উমরাহও ছিল। সেই ফেরেশ্‌তারা এ আমলগুলোকে নিয়ে একের পর এক আকাশ এবং একের পর এক দরজা অতিক্রম করে চতুর্থ আকাশের দরজায় পৌঁছল। তখন সেই দরজার দারোয়ান ফেরেশ্‌তা তাদেরকে বলল, থাম। তোমরা এই আমলসমূহ তার কর্তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আর তার মুখের ওপর ছুড়ে মার। সেই ফেরেশ্‌তা বলল, আমি স্বার্থপরতার ফেরেশ্‌তা এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই আদেশ দিয়ে এখানে দাঁড় করিয়েছেন যে, আমি যেন এমন কোন বান্দার আমল এই চতুর্থ দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে না দেই, যার মাঝে স্বার্থপরতা পাওয়া যায় অর্থাৎ সে যেন নিজ সত্ত্বাকে আল্লাহ্ তা'লার শরীক মনে করেছে এবং স্বার্থপরতার অনুভূতি তার মাঝে পাওয়া যায় এবং খোদার বান্দা হওয়ার অনুভূতি তার মাঝে পাওয়া যায় না। আর আমার প্রভু আমাকে এই আদেশই দিয়েছেন যে, এই লোক যখনই কোন কাজ করত, তখন স্বার্থপরতাকে তার একটা অংশ বানিয়ে নিত। তার আমল আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়।

রসূলে করীম (সা.) বলেন ফেরেশ্‌তাদের পঞ্চম একটি দল অপর এক বান্দার আমল নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। সেই আমলসমূহ সম্বন্ধে ফেরেশ্‌তাদের ধারণা ছিল–

"কা আন্নাহুল আবুসুল মাযফুফাতু ইলা বা'লিহা' অর্থাৎ তা এক অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত নববধূর মত, যে সুগন্ধ ছড়ায় এবং নিজ বরের কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন তারা চার আকাশ পার করে পঞ্চম আকাশে উপস্থিত হয়, তখন তার দারোয়ান-ফেরেশ্‌তা বলল থাম। এই আমলসমূহকে ফেরত নিয়ে যাও এবং সেই ব্যক্তির মুখে ছুড়ে মার। আর তাকে বলে দাও, তোমার খোদা এই আমল সমূহকে কবুল করতে রাজি নন, কেননা, আমি হিংসার ফেরেশ্‌তা আর আমার খোদা আমাকে হুকুম দিয়েছেন যেন হিংসুক কোন ব্যক্তির আমলকে পঞ্চম আকাশের দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে না দেই। এই ব্যক্তি প্রত্যেক জ্ঞান অর্জনকারী এবং সৎকর্ম সম্পাদনকারীর ওপর হিংসা করত। আমি তার আমলকে এই দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে দিব না। সে যখনই কোন জ্ঞানীকে দেখত বা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে দেখত, তাকে হিংসা করত। তাই এদিক দিয়ে অতিক্রম করার প্রশ্নই আসে না।

অত:পর আঁ হযরত (সা.) বলেন, ফেরেশ্‌তাদের ষষ্ঠ একটি দল অপর এক বান্দার আমল নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল এবং প্রথম পাঁচটি দরজা অতিক্রম করে ষষ্ঠ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এই আমলসমূহের মাঝে রোযাও ছিল, নামাযও ছিল, যাকাতও ছিল, হজ্জ এবং ওমরাহও ছিল। আর ফেরেশ্‌তারা ভেবেছিল এইসব আমল খোদা তা'লার নিকট অত্যন্ত গ্রহণীয় হবে। কিন্তু যখন তারা ষষ্ঠ আকাশে পৌঁছল, তখন সেখানকার দারোয়ান-ফেরেশ্‌তা বলল, থাম। সামনে যেও না। 'ইন্নাহু কানা লা ইয়ারহামু ইনসানান মিন ইবাদিল্লাহে।' অর্থাৎ এ ব্যক্তি খোদা তা'লার বান্দাদের কারও ওপর রহম করত না। আর খোদা তা'লা আমাকে এখানে এই জন্য দাঁড় করিয়েছেন যেন যেসকল আমলে নির্দয়তার মিশ্রণ রয়েছে, সেগুলোকে আমি এই দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে না দেই। তোমরা ফিরে যাও আর এই আমলগুলোকে সেই ব্যক্তির মুখের ওপর এই বলে ছুড়ে মার যে তোমার নিজ জীবনের পদ্ধতি হল এই যে তুমি খোদার বান্দাদের প্রতি রহম করার পরিবর্তে অত্যাচার করতে। খোদা তা'লা কিভাবে তোমার ওপর রহম করে তোমার এইসব আমল কবুল করবেন। যখন তুমি রহম (দয়া) কর না, তখন খোদা তা'লাও তোমার প্রতি রহম করবেন না।

নবী আকরাম (সা.) বলেন, আরও কতিপয় ফেরেশ্‌তা আরেক বান্দার আমল নিয়ে একের পর এক আকাশ ও একের পর এক দরজা অতিক্রম করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেই আমল সমূহের মাঝে নামাযও ছিল, রোযাও ছিল, ফিকাহ্ এবং ইজতেহাদ বা চেষ্টা-প্রচেষ্টাও ছিল এবং ওয়ারা বা পরহেযগারীও ছিল । এবং বলল 'লাহা দাভিয়ান কাদাভয়্যিন নাহলে ওয়া যাওউন কাযাউইশ শামসে'

খোদা তা'লার এক বান্দা যতই নেক আমল করতে থাকুক না কেন, তার মাঝে কোন না কোন ত্রুটি থেকে যায়। এজন্য তুমি নিজ আমল সমূহের ওপর গর্ব করো না। বরং এ বিশ্বাস পোষণ কর যে, আমাদের খোদা ও মাওলা তো এমন যে, তিনি সে সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিজ বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখ এবং তার দ্বারা কাউকে কষ্ট দিওনা। তা দিয়ে কোন খারাপ কথা বলো না। আর নিজেকে অন্যদের চেয়ে অধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে করো না এবং নিজের পরহেযগারীর প্রচার করো না।

অর্থাৎ সেই আমলগুলো থেকে মৌমাছির আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ আসছিল অর্থাৎ সেই ফেরেশ্‌তারা গর্বের সাথে গুণগুণ করছিল যে আমরা খুব ভাল জিনিস খোদা তা'লার কাছে উপস্থাপন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। আর সেই আমলগুলো সূর্যের আলোর মত চমকাচ্ছিল। তাদের সাথে তিন হাজার ফেরেশ্‌তা ছিল। যেন সেই আমলগুলো এতো বেশী ভারী ছিল যে, তিন হাজার ফেরেশ্‌তা তার ভার বহন করছিল। যখন তারা সপ্তম আকাশের দরজায় পৌঁছল, তখন সেখানে নিযুক্ত দারোয়ান ফেরেশ্‌তা বলল, থাম। তোমরা সামনে যেতে পারবে না। তোমরা ফিরে যাও এবং এই আমলগুলোকে সেই ব্যক্তির মুখের ওপর ছুড়ে মার। আর তার হৃদয়ে তালা লাগিয়ে দাও, কেননা খোদা তা'লা আমাকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তাঁর কাছে এমন কোন আমল উপস্থাপন না করি, যেগুলো কেবলমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং তার মাঝে অন্য জিনিসের মিশ্রণ পাওয়া যায়।

সেই ব্যক্তির এইসব আমল আল্লাহ্‌র জন্য করেনি। এই ব্যক্তি ফকীহ (বিজ্ঞ) লোকদের সভাসমূহে বসে এবং গর্বে নিজের ঘাড় উঁচু করে বিজ্ঞতা ও ইজতেহাদের কথা বলে যেন তাদের মাঝে সে এক উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। সে এই সকল আমল আমার সন্তুষ্টির খাতিরে করে নি। বরং শুধুমাত্র আত:গর্ব প্রকাশের জন্য করেছে। 'ওয়া যিকরান ইনদাল উলাময়ে ওয়াসীয়্যাতান ফিল মাদায়েনে'-তার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে এক বড় বুযুর্গ হিসেবে পরিচিত হওয়া, আলেমদের সভাসমূহে যেন তার কথা আলোচনা হয়। সেই সকল কাজ, যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য করা হয়নি এবং যার মাঝে লোক-দেখানোর প্রবণতা পাওয়া যায়, সেই সকল কাজ খোদার কাছে গ্রহনীয় নয়। সেই ফেরেশ্‌তা বলল আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, আমি যেন এমন আমলসমূহকে অতিক্রম করতে না দেই। তোমরা ফিরে যাও এবং এই আমলসমূহকে সেই ব্যক্তির মুখে ছুড়ে মার।

নবী করীম (সা.) বলেন, আরও কতিপয় ফেরেশ্‌তা এক বান্দার আমল নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল এবং সাত আকাশের ফেরেশ্‌তারাই তাদের যেতে দিল। সেই সকল আমলের ওপর তাদের কোন আপত্তি ছিল না। আকাশের যত দারোয়ান ছিল সবাই বলল, তার আমল ঠিক আছে, বাহ্যত সম্পূর্ণরূপে ভাল এবং যেতে দিল। সেই সকল আমলের মধ্যে যাকাতও ছিল, রোযাও ছিল, নামাযও ছিল, হজ্জও ছিল, ওমরাহও ছিল, উত্তম চরিত্রও ছিল, যিকরে ইলাহীও ছিল। আর যখন সেই ফেরেশ্‌তারা ঐ আমলগুলোকে নিয়ে খোদা তা'লার কাছে উপস্থাপনের জন্য রওয়ানা হল। তখন আকাশসমূহের ফেরেশ্‌তারাও তাদের সঙ্গী হয়ে গেল। আর তারা সকল দরজা অতিক্রম করে খোদা তা'লার দরবারে উপস্থিত হল।

সেই ফেরেশ্‌তারা খোদা তা'লার সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, হে আমাদের প্রভু! তোমার এই বান্দা সর্বদা তোমার ইবাদতে ব্যস্ত থাকে। আর আমরা তার সকল নেক আমল ও তার ইখলাসের সাক্ষ্য দিচ্ছি। সে অনেক পুণ্য করে থাকে। আর নিজের সকল প্রিয়-সময় তোমার আনুগত্যে খরচ করে। সে তোমার অত্যন্ত মোখলেস বান্দা। তার মাঝে কোন ত্রুটি নেই। অর্থাৎ ফেরেশ্‌তারা সেই লোকের খুব প্রশংসা করল। খোদা তা'লা বললেন, 'আনতুমুল হাফাযাতু আলা আমালে আবদী।' অর্থাৎ তোমাদের তো আমি আমলসমূহের সুরক্ষা এবং সেগুলো বর্ণনা করার জন্য নির্ধারণ করেছি। তোমরা শুধু মানুষের বাহ্যিক আমলের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিপিবদ্ধ কর। অত:পর

বলেন, 'ওয়া আনার রাকীবু আলা কালবে' অর্থাৎ আমি বান্দার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি দেই। সেই বান্দা এইসব আমল করার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি চায়নি বরং তার নিয়্যত ও উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল। সে আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে খুশি করতে চেয়েছিল। 'ফাআলাইহে লা'নাতী' অর্থাৎ তার ওপর আমার অভিশাপ। এর ফলে সকল ফেরেশ্‌তা বলে উঠল 'আলাইহে লা'নাতুকা ওয়া লা'নাতুনা' অর্থাৎ তার ওপর তোমারও অভিশাপ এবং আমাদেরও অভিশাপ। এবং এরপর সাত আকাশ এবং সেখানে অবস্থানকারী সবাই তার ওপর অভিশাপ দেয়া শুরু করে দিল বা শুরু করে দিবে। হযরত মুআয (রা.) যখন রাসূলে করীম (সা.) এর এই ওসীয়্যত বা নসীহত শুনলেন, তখন তার হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ 'কাইফা লী বিননাজাতে ওয়াল খালাসে' অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসূল, যদি আমলসমূহের এই অবস্থা হয়, তাহলে আমরা কিভাবে নাজাত পাব এবং আমি আমার প্রভুর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে কিভাবে মুক্তি পাব?

তিনি বলেন, 'ইকতাদে বী' অর্থাৎ তুমি আমার সুন্নতের ওপর আমল কর আর এই বিশ্বাস রাখ যে, খোদা তা'লার এক বান্দা যতই নেক আমল করতে থাকুক না কেন, তার মাঝে কোন না কোন ত্রুটি থেকে যায়। এজন্য তুমি নিজ আমল সমূহের ওপর গর্ব করো না। বরং এ বিশ্বাস পোষণ কর যে, আমাদের খোদা ও মাওলা তো এমন যে, তিনি সে সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিজ বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। "ওয়া হাফিয আলা লিসানিকা" আর নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখ এবং তার দ্বারা কাউকে কষ্ট দিওনা। তা দিয়ে কোন খারাপ কথা বলো না। "ওয়া লা তুযাক্কে নাফসাকা আলায়হিম" আর নিজেকে অন্যদের চেয়ে অধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে করো না এবং নিজের পরহেযগারীর প্রচার করো না।

"ওয়া লা তুদখিল আমালাদ্ দুনিয়া বিল আমালিল আখিরাহ" আর যে সকল কাজ তোমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও পরকালের লাভের জন্য করে থাক, তার সাথে পার্থীবতার সংমিশ্রন করো না। "ওয়া লা তুমাযযেকীন নাসা ফা ইয়ামাযযাকুকা কিলাবুন নার" অর্থাৎ মানুষের মাঝে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি ও তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করো না। যদি তোমারা তা করো, তাহলে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের কুকুর তোমাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করবে। "ওয়ালা তুরা বেআমালিকান নাসা" অর্থাৎ তোমাদের আমল লোক দেখানোর জন্য পৃথিবীতে প্রদর্শন করো না। যদি এমন করেও ফেল, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ফযল তোমাদের সাথে আছে। (রুহুল বয়ান প্রথম খন্ড ৭৮-৮০ পৃষ্ঠা সূরা বাকারার ২২ নং আয়াত অনুসারে। ২০০৩ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক ২০০৩ সালে প্রকাশিত।)

অতএব প্রকৃত এবং গ্রহণীয় নেকী করার তৌফিক তখনই লাভ হয়, যখন আঁ হযরত (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শ আমাদের দৃষ্টিপটে থাকে। সাফল্যের সুসংবাদ থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে নিজ ও নিজ জামাতের দূর্বলতা সমূহকে সামনে রেখে দোয়া করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করা সত্ত্বেও এবং ভবিষ্যতের জন্য সুসংবাদ দেয়া সত্ত্বেও তিনি সেজদায় ছটফট করে এবং অস্থিরতার সাথে দোয়া করতেন আর যখন তার সেই অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করা হতো, তখন বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা তো অমুখাপেক্ষী। একে তো তাঁর ভয় আর দ্বিতীয়ত আমি কেন আল্লাহ্ তা'লার সেই সকল অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব না, যা তিনি আমার ওপর করেছেন? আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কতই না পুরস্কার দান করেছেন আর এই উম্মতের জন্য কতই না প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি কি তার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো না। অতএব এই হলো সেই সর্বোত্তম আদর্শ, যা তিনি (সা.) আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।

যদি বান্দার অধিকারের প্রশ্ন আসে, তাহলে কোন বাছবিচার ছাড়াই তিনি সকলেরই উপকারে এসেছেন এবং সকলকেই আর্থিকভাবে সহযোগীতা করেছেন। যে-ই চাইতে এসেছে, তার চাহিদা পূর্ণ করেছেন। প্রত্যেকেই তার দয়ার অংশ পেয়েছে, তার ভালবাসা ও নম্রতা থেকে কল্যাণ লাভ করেছে। সুতরাং তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ভয়ের সাথে সেভাবে তাঁর ইবাদত কর, যেভাবে আমি করে থাকি। সেভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দা হও, যেভাবে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকি। সেভাবে রহমান খোদার বান্দা হও, যেভাবে আমি তাঁর অধিকার আদায় করে থাকি। যেভাবে আমি এ আদর্শসূমহ স্থাপন করেছি সেভাবে তোমরাও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ অর্জনকারী হয়ে যাও। আর যেভাবে আমি বান্দার অধিকার আদায় করেছি, যদি তোমরা সেভাবে আমার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিঃস্বার্থ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের অধিকার আদায় করো, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ অর্জনকারী হতে পারবে। যদি তোমরা নিজেদের নেকী সমূহের ব্যাপারে মনে করো, আমি অনেক নেকী করে ফেলেছি। নিজ ইবাদত সমূহকে যদি যথেষ্ট মনে করো অথবা যদি কেবল সেগুলোর ওপরই ভরসা করে বসে থাক, তাহলে তোমরা খোদার অনুগ্রহ অর্জনকারী হতে পারবে না।

অতএব সুন্নতের ওপর চলার জন্য এবং তাঁর (সা.)-এর উত্তম আদর্শের অনুসারী হওয়ার জন্য আমাদের সর্বদা নিজেদেরকে যাচাই করে যেতে হবে। খোদা তা'লার প্রতি বিনীত অবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ যাচনা করতে হবে। কেননা আমরা তো জানি না, আমাদের আমল সেই মানের হচ্ছে কি-না, যা খোদা তালা আমাদের কাছ থেকে চান। সুতরাং আমাদের এই দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের আমল সমূহকে নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী বানিয়ে দেন এবং কেবল ও কেবলমাত্র নিজ অনুগ্রহ দ্বারা যেন সেগুলোকে কবুল করে নেন। আমাদের আমল যেন এমন না হয় যে, পার্থিবতার সংমিশ্রণের কারণে তা আমাদের মুখের ওপরই ছুড়ে মারা হবে। আমাদের এ দোয়া করা উচিত, আমরা যেন এ পৃথিবীতেও আল্লাহ তা'লার জান্নাত লাভকারী হই এবং নিজেদের সকল আমলকে তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী করার মাধ্যমে পরকালেও তাঁর অনুগ্রহ অর্জনকারী হই আর পরবর্তী জীবনেও যেন সেই জান্নাতের

উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা কেবল ও কেবলমাত্র নিজ অনুগ্রহ দ্বারাই যেন আমাদের এ দোয়া সমূহ কবুল করেন।

এখন আমি জুমুআর নামাযের পর কয়েকটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথমটি একজন শহীদের। আর দ্বিতীয়টি কয়েকজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর। যিনি শহীদ হয়েছেন তিনি হলেন মোকাররম এযায আহমদ কায়ানী সাহেব, পিতা: মোকাররম বশির আহমদ কায়ানী সাহেব। তিনি আওরঙ্গী টাউন করাচীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮ সেপ্টেম্বর শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন।

তাকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা আওরঙ্গী টাউনে গুলি করে শহীদ করেছে। বিস্তারিত ঘটনা হল, মোকাররম এযায আহমদ কায়ানী সাহেব ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর সাইকেলে করে চাকুরীর উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি কিছুদূর যাওয়ার পর স্পিড ব্রেকারে মোটর সাইকেলের গতি কমালে দুই জন মোটর সাইকেল আরোহী তার নিকটবর্তী হয়ে তার বাম পার্শ্বদেশে দুটি গুলি করে। এতে তিনি মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যান। পড়ে যাওয়ার পর আবার উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করলে আক্রমনকারীরা পুনরায় সামনে থেকে তার ওপর গুলি ছুড়ে। নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি বাম হাত সামনে বাড়ালে আক্রমনকারীরা তার হাতে গুলি করে। তারপর তার বুকে তিনটি গুলি করে। তিনি পড়ে গেলে তার মাথায় পিছন দিক থেকে আরো একটি গুলি করে, যার ফলে তিনি আঘাতের যন্ত্রনায় কাতরানোর পূর্বেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন।

গত মাসের ২১ আগষ্ট তার ভগ্নিপতি মোহতরম জহুর আহমদ কায়ানী সাহেবকেও একই এলাকায় শহীদ করা হয়। মোকাররম এযায আহমদ কায়ানী সাহেবের পরিবারে আহমদীয়াতের বীজ তার পিতার দুই চাচা মোকাররম ইউসুফ কায়ানী সাহেব এবং মোকাররম মোহাম্মদ সাইদ কায়ানী সাহেবের মাধ্যমে বপিত হয়। তারা দুইজন ১৯৩৬ সালে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার অর্থাৎ শহীদের পিতা এবং পিতার দুই চাচা অনেক শিক্ষিত ছিলেন এবং বড়ই জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন। তারা অনেক পড়াশুনা এবং গবেষণা করার পর বয়াত নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শহীদ মরহুমের পরিবার আযাদ কাশ্মীর এর মোজাফফরাবাদ এর প্রেমকোট এর অধিবাসী ছিলেন। শহীদ মরহুম ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। করাচীতেই তিনি ইন্টার পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পূর্বে পাকিস্তান মিলিটারী অর্ডিনেন্স এর সিভিলিয়ান ড্রাইভার হিসেবে চাকুরী নেন।

শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ২৯ বছর। ২০০৯ সালে কাশ্মীরের কোটলীর অধিবাসী রাজা আব্দুর রহমান সাহেবের মেয়ে সওবিয়াহ সাহেবাকে বিয়ে করেন। শহীদ মরহুম নিতান্ত নিষ্ঠাবান, শান্তিপ্রিয়, নরম ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। জামাতের খেদমতে তিনি সর্বদা সাহায্য ও সহযোগীতা করতেন।

যখনই কোন ডিউটিতে তাকে ডাকা হতো, তিনি সর্বদা আনুগত্যের উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন। তার ভাই মোকাররম এযায আহমদ কায়ানী সাহেব বলেন, শাহাদাতের একদিন পূর্বে নিজ ভগ্নীপতি শহীদ মোকাররম জহুর আহমদ কায়ানী সাহেবের কথা উঠলে তার অর্থাৎ শহীদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি জহুর কায়ানী সাহেবকে খুবই সম্মান করতেন এবং বড় ভাই ও পিতার মর্যাদা দিতেন। তার শাহাদাতের পর এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় নাই, যেদিন তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তার সন্তানদের খোঁজ নেন নি। তার শাহাদাতের ঘটনা তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। শহীদ মরহুমের মাতা বর্ণনা করেন, চার বোনের পর অনেক দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা এ পুত্র দান করেছিলেন। সে অত্যন্ত ভেবেচিন্তে কথা বলত।

আমার সাথে তার অসীম ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। ডিউটিতে যাওয়ার সময় হাত মিলিয়ে খোদা হাফেয বলে তারপরে যেত। আমার ঔষধের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতো। বোনদের প্রতি এমনভাবে খেয়াল রাখতো যেন সে তাদের বড় ভাই। বড়ই নম্র স্বভাবের ছিল। যখনই ঘরে কোন জিনিস আনতো, তখন সবাইকে দেয়ার ইচ্ছা পোষন করতো। তার স্ত্রী বলেন, শহীদ মরহুম অত্যন্ত নেক স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেকের অধিকার আদায় করতেন। তিনি একজন সুযোগ্য পুত্র, ভাই, আদর্শ পিতা এবং দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন। তিনি বলেন, যখনই আমি অস্থির হতাম, তিনি আমাকে সান্তনা দিতেন। আল্লাহ তা'লার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সন্তানের প্রতি অসীম ভালবাসা প্রদর্শন করতেন।

গত মাসে যখন তার ভগ্নিপতি শাহাদাত বরণ করেন, তখন তিনি বারবার বলেন, হায়! তার জায়গায় যদি আমি হতাম। শহীদ মরহুম নিজ পিতা মাতা, একজন ৪ বছরের মেয়ে যার নাম স্নেহের দূররে আদন এযায এবং দেড় বছরের একজন পুত্র সন্তান যার নাম বুরহান আহমদ, তাদের রেখে যান।

এ দিক দিয়ে করাচীতে বর্তমানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। মনে হয় একটি দল আছে, যারা আহমদীদের ওপর হামলা করার পরিকল্পনা করছে। আর দলটি এ উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য খুব দ্রুত পরিকল্পনা করুন। আসলে মোল্লারা এবং তাদের সঙ্গীরা সরকারের উস্কানীতেই এসব করছে। আল্লাহ্ তা'লা এ অত্যাচারী দলকে শাস্তি দেবার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। খুব বেশী দোয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে করাচীর জন্য। কিন্তু সাধারণভাবে সমগ্র পাকিস্তানের অবস্থাই খারাপ। একইভাবে লাহোরেও কিছু আহমদীকে অপহরণের করার চেষ্টা করা হয়েছে, এমনকি মেরে ফেলারও চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সেখানে সকল আহমদীকে সুরক্ষিত ও শান্তিতে রাখুন।

দ্বিতীয় যে জানাযাটি আজকে এর সাথে আদায় করা হবে সেটি হল মোকাররম আব্দুল মোমেন সাহেব দরবেশের, যিনি মোকাররম আল্লাহ দিত্তা সাহেবের পুত্র

ছিলেন। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে তিনি অল্প দিনের অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে ৯৭ বছর বয়সে মৃতুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন।

তিনি ১৯১৬ সালে সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ফয়সালাবাদের জাড়ানওয়ালায় তিনি বড় হন এবং সেখানেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। আনুমানিক ১৯৪৫ সালের দিকে ধর্মীয়-জ্ঞান অর্জনের উদ্দ্যেশে কাদিয়ানে এসেছিলন। এখানেই প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের সময় তা আর টিকে নি। সে ঘরে কোন সন্তানাদি ছিল না। দরবেশী যুগে উড়িষ্যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মোকাররম সৈয়দ ওসীকুউদ্দীন সাহেবের নাতনি এবং মোকাররম সৈয়দ মুহিউদ্দীন সাহেবের বড় মেয়ে আমাতুল্লাহ ফাহমিদা সাহেবার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়। তার গর্ভে আট সন্তানের জন্ম হয়, যার মাঝে পাঁচজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে। তাঁর পাঁচ ছেলেই জামাতে আহমদীয়ার সেবায় রত আছে। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল এবং অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে নিজ দরবেশী-জীবন অতিবাহিত করেছেন। দোকানদারী এবং বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম করে সংসার চালাতেন। তিনি দর্শনার্থী বিভাগে সেবা প্রদান করেছেন। অমুসলিমদেরকে খুবই আগ্রহের সাথে তবলীগ করতেন। তিনি দেহাতী মোবাল্লেগ হিসেবেও কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সে যুগেই তিনি সাহিত্যে ফাযেল ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি রোযা ও নামাযে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। এছাড়া অত্যন্ত সাধু ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। শারীরিক দূর্বলতা সত্ত্বেও শেষ বয়স পর্যন্ত বাজামাত নামায দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। কোরআন করীমের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা রাখতেন। নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করতেন। মরহুম একজন মুসীও ছিলেন।

তৃতীয় জানাযাটি মোকররম শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের, যিনি গত ১২ সেপ্টেম্বর ৯৪ বছর বয়সে কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। তিনি ১৯৪৩ সালে ২৪ বছর বয়সে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। শুরুতে তিনি দিল্লীতে আমিরাকান দূতাবাসের কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে প্রথমে লাহোরে ও পরে করাচীতে স্থানান্তরিত হন, যেখানে চৌধুরী শাহ নেওয়াজ সাহেবের কাছ থেকে ঔষুধ সরবরাহের কাজ শুরু করেন। তার বাড়িতে জায়গা না থাকার কারণে অফিসেই ঘুমাতেন। ১৯৫০ সালে চৌধুরী শাহ নেওয়াজ সাহেবের সাহায্যে তিনি নিজের ব্যবসা শুরু করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বরকত দান করেন। পার্থিব শিক্ষা শুধুমাত্র মেট্রিক পর্যন্ত ছিল, কিন্তু বাহ্যত তাকে অনেক শিক্ষিত মনে হতো। আর প্রত্যেকেই ভাবতো, তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত। ১৯৫০ সালে তিনি করাচীর নায়েব আমীর পদে নিযুক্ত হন।

১৯৫৩ সালের দাঙ্গার সময় হযরত মোসলেহ মাওউদ (রা.) তাকে চৌধুরী আব্দুল্লাহ খান সাহেবের স্থলে করাচী জামাতের আমীর নিযুক্ত করেন। চৌধুরী সাহেব যেহেতু সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন, তাই তাকে চাকুরীচ্যুত করার সম্ভাবনা ছিল। যদিও এরপরে চৌধুরী সাহেবের শারিরীক অসুস্থতার কারণে তিনি করাচী জামাতের আমীর হিসেবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৩ সালে করাচীর যে ইতিহাস লেখা হয়েছিল, সেখানে লেখা আছে, ১৯৫৩ সালের দাঙ্গার সময় হযরত মোসলেহ মাওউদ (রা.) করাচীতেও একটি পৃথক সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর নাযেরে আলা হিসেবেও তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

হযরত মোসলেহ মাওউদ (রা.)-এর দীর্ঘ অসুস্থতার সময় যে নিগরান বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি তারও সদস্য ছিলেন। খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত, স্পষ্টভাষী, অধিক পরিমানে দোয়াকারী ছিলেন। অধিক পরিমাণে আর্থিক কুরবানী করতেন। উদার, নিষ্ঠাবান ছিলেন। খেলাফতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আমার খিলাফতের সময়ও তিনি আমার সাথে অধিক ভালবাসার সর্ম্পক রাখতেন এবং সব সময় তিনি এ বিষয়টি অনুভব করতেন। আর এ ব্যাপারে ছোট ছোট কষ্টও অনুভব করতেন। বন্ধু-বান্ধবদের, স্নেহভাজনদের এবং অভাবীদেরকেও তিনি আর্থিক সহযোগীতা করতেন। তার বন্ধুবহর অনেক বিস্তৃত ছিল। এমনকি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল এবং বিশ্বব্যাপী তার বন্ধুবহরের এই বিস্তৃতির কারণে তবলীগেরও সুযোগ পেতেন। আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি মুসী ছিলেন। তার এক ছেলে ডাক্তার নাসীম রহমতুল্লাহ্ সাহেব দীর্ঘদিন যাবত ক্লিউল্যান্ড জামাতের সদর এবং আমেরিকার নায়েব আমীর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আর জামাতের ওয়েবসাইট ধষরংষধস.ড়ৎম এর চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। তার দ্বিতীয় ছেলে শেখ ফারহাতুল্লাহ্ সাহেব ফয়সালাবাদের নায়েব আমীর এবং একইভাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শূরা বোর্ডের সানাত ও তেজারাত বিভাগের সদর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তার এক মেয়ে জামিলা রহমানী সাহেবা এখানেও লাজনা ইমাইল্লাহতে সেবা করেছেন। তার স্বামী গোলাম রহমানী সাহেবও দীর্ঘদিন যাবত যুক্তরাজ্য জামাতের সেক্রেটারী ওসীয়ত ছিলেন। একইভাবে তার ছোট মেয়ে নুসরাত মালেক সাহেবা আমেরিকার কলম্বাস এবং ইষ্ট মিডওয়েষ্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এ সকল মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের নিকটাত্মীয়দের ধৈর্য্য ধারনের তৌফিক দিন। বিশেষ করে সেই শহীদের বাবা-মাকে, যাদের যুবক-ছেলে শহীদ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তালা তাদেরকে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রদান করুন এবং তার ছোট বাচ্চাদের অভিভাবক হোন এবং তাদেরকে নিজ সুরক্ষা ও শান্তিতে রাখুন।

দ্বিতীয় কথা হল, ইনশাল্লাহ্‌তা'লা আমি কয়েক সপ্তাহের জন্য সফরে যাচ্ছি। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন সকল দিক থেকে এই সফরকে কল্যানমন্ডিত করেন এবং সফরের যে সকল উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলো যেন আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহ দ্বারা পূর্ণ করে দেন। (আমীন)

অনুবাদ: জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

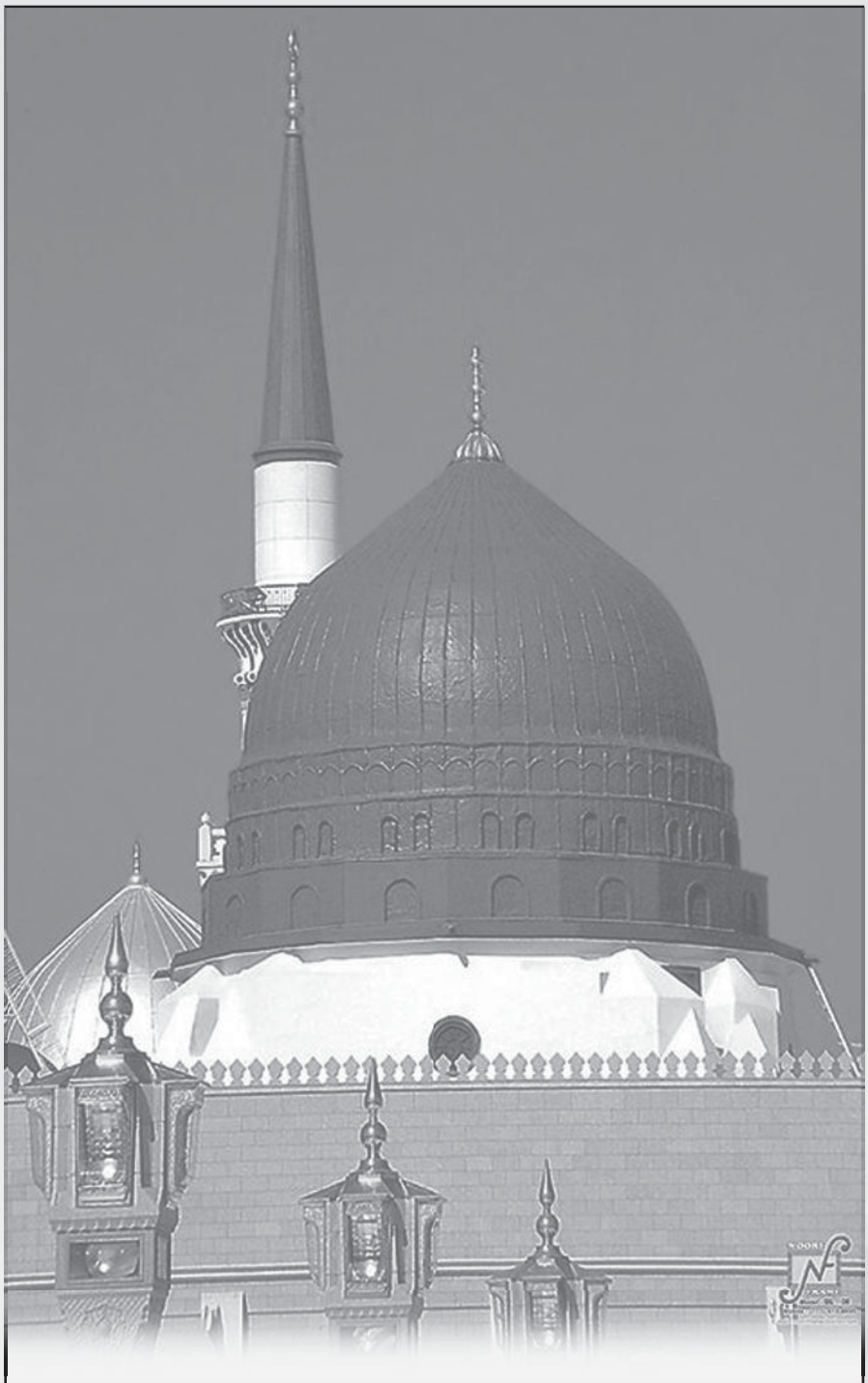

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

খোদা তা'লার প্রতি আস্থা ও ভরসা

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি হযরত রাসূল পাক (সা.)-এর আস্থা ও ভরসা (তাওয়াক্কুল)-এর অবস্থা এই ছিল যে, একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে একলা পেয়ে তাঁর ওপর তরবারি উঁচিয়ে ধরে বললো, 'এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে'? ঐ সময়ে তাঁর (সা.) হাতে কোন হাতিয়ার ছিল না এবং তিনি শায়িত অবস্থায় ছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কোন কিছু করার উপায়ও ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও, তিনি (সা.) অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ও নির্লিপ্তভাবে প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন–***'আল্লাহ্'***। এই শব্দ তাঁর মুখ থেকে এত দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিলো যে, সেই কাফেরের হৃদয়ও তাঁর (সা.) ঈমান-এর আশ্চর্য শক্তি এবং তাঁর ইয়াকীন-এর প্রখর প্রভাবে অভিভূত না হয়ে পারেনি। ফলে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। এবং সে, যে কি-না তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল, তাঁর (সা.) সামনে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো। (মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'লার সামনে তাঁর (সা.) বিনয়-এর সীমা এটাই ছিল যে, যখন লোকেরা তাঁকে বলতেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি তো আপনার সৎকর্ম বা আমল এর জোরেই খোদা তা'লার ফযল, আশিস ও কৃপা লাভ করতে পারবেন।' তখন উত্তরে তিনি বলতেন, 'আমিও খোদার অনুগ্রহের কল্যাণেই নাজাত (পরিত্রাণ) লাভ করবো"। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, কোন ব্যক্তিই নিজের আমল-এর জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। 'আমি তখন বললাম, আপনিও কি আপনার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না? তিনি বলেছিলেন, না, আমিও নিজের আমল-এর জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না। তবে, খোদার কৃপা ও তাঁর রহমত যদি আমাকে আবৃত

করে নেয়, তাহলে, একটা উপায় হতে পারে (বুখারী)। তিনি (সা.) বলেছিলেন, 'নিজের কাজকর্মে পুণ্য অবলম্বন করো, এবং খোদা তা'লার নৈকট্যের পথ অনুসরণ করো। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, কেননা, সে যদি সৎ হয়, তাহলে সে জীবিত থেকে আরও বেশি বেশি সৎকাজ করতে পারবে ; আর যদি সে অসৎ হয়, তাহলে জীবিত থেকে সে তার পাপসমূহের জন্য তওবা করবার সুযোগ পাবে"। (বুখারী)

খোদা তা'লার প্রতি তাঁর (সা.) ভালবাসার এই অবস্থা ছিল। শুকনো মৌসুমের পর যখন প্রথম বৃষ্টি নামতো, তখন তিনি তাঁর জিহ্বায় বৃষ্টির ফোটা নিতেন এবং বলতেন, 'দেখো! আমার প্রতিপালকের তাজা নেয়ামত।'

যখনই কোন মজলিসে বসতেন, তিনি ইস্তেগফার (ক্ষমা-প্রার্থনা) করতেন। আর এমনিতেই তিনি সব সময় ইস্তেগফার করতেন, যাতেকরে তাঁর উম্মত এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাই খোদা তা'লার গযব (ক্রোধ) থেকে বঁচে থাকে এবং তাঁর ক্ষমার অধিকারী হয়ে যায় (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি (সা.) সর্বদাই খোদাতাআলার সামনে হাজির থাকবার কথা মনে রাখতেন। এমনকি, তিনি যখন শু'তে যেতেন তখনও এই কথা বলতে বলতে শু'তেন ঃ.....হে আল্লাহ্ তোমারই নাম নিয়ে আমি মরি, এবং তোমারই নাম নিয়ে আমি উঠি।' এবং যখন তিনি প্রত্যুষে উঠতেন, তখন বলতেন ঃ..... 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন, এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (বুখারী)

খোদা তা'লার নেকট্য লাভের আকাংখা তাঁর এত প্রবল ছিল যে, তিনি সর্বক্ষণ দোয়া করতেনঃ....."হে আমার প্রভু! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার নূর (আলো) দ্বারা ভরপুর করে দাও, আমার ডানেও এবং আমার বামেও তোমার আলো দ্বারা আলোকিত করে দাও। আমার ঊর্ধ্ব তোমার আলোকে আলোকিত হোক, আমার নিম্নও তোমার আলোকে আলোকিত হোক। এবং হে আমার প্রভু! আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আলোয় আলোকিত করে দাও'। (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তাঁর (হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) ওফাতের কিছুদিন পূর্বে মুসায়লামা কায্‌যাব এসেছিল এবং সে বলেছিল, যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরে আমাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে যান, তাহলে আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেব।' ঐ সময় তার সঙ্গে ছিল একটি বিশাল বাহিনী এবং যে কওমের (গোত্রের) সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল (অর্থাৎ যে কওমের প্রতিনিধি সে ছিল), সেই কওমটিও ছিল আরবের সকল গোত্রের মধ্যে জনসংখ্যায় সর্বাধিক। রাসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন তার মদীনায় আগমনের খবর গিয়ে পৌঁছলো, তখন তিনি (সা.) তার কাছে চলে গেলেন। সাবেত বিন কায়েস বিন শামস তাঁর (সা.) সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ছিল খেজুরের একটি ডাল। তিনি (সা.) সেই কাফেলার কাছে গেলেন এবং মুসায়লামা কায্‌যাবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই পরিস্থিতিতে অন্যান্য সাহাবীরাও সেখানে এসে সমবেত হলেন।

আঁ হযরত (সা.) মুসায়লামাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি তো এই কথা বলতে এসেছ যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি তাঁর পরে তোমাকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেন, তাহলে তুমি তাঁর (সা.) আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত আছ। কিন্তু আমি তো খোদার হুকুমের খেলাফে তোমাকে এই খেজুরের ডালটি দিতেও প্রস্তুত নই। তোমার পরিণতি তা-ই হবে, যা খোদা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন । যদি তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলেও যাও, তো আল্লাহ্‌তাআলা তোমার পা দুটো কেটে দিবেন। এবং আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে, খোদা যা কিছু আমাকে দেখিয়েছিলেন, তা সবই এখন সংঘটিত হওয়ার সময় এসে যাচ্ছে।' অতঃপর, তিনি (সা.) বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি, তোমার যদি কোন কথা থাকে,তুমি তা সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্‌স-এর কাছে বলতে পার, সে-ই থাকলো আমার পক্ষে।' এই কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। হযরত আবু হুরায়রাও (রা.) ছিলেন তাঁর সঙ্গে। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এটা কি বললেন, খোদা আমাকে যা কিছু দেখিয়েছেন, আমি তোমাকে তেমনিই দেখতে পাচ্ছি।' রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি রুইয়াতে (স্বপ্নে) দেখেছিলাম যে, আমার হাতে দুটি কংকণ। আমি ঐ কংকণ দুটি দেখে না-পসন্দ করেছিলাম। ঐ সময়ে স্বপ্নের মধ্যেই আমার প্রতি এই ওহী অবতীর্ণ হলো যে,আমি যেন ওগুলির ওপরে ফুঁ দিই। যখন আমি ফুঁ দিলাম, তখন দুটো কংকণই উড়ে গেল। আমি এই স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) এটাই করেছিলাম যে, আমার পরেই দুজন মিথ্যা দাবীদারের আবির্ভাব ঘটবে (বুখারী)

তখন ছিল রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ অধ্যায়। আরবের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বশেষ গোত্রটিও আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল ; শুধু এতটুকুই শর্ত দিয়েছিল যে, তাদের নেতাকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরে খলীফা নিয়োজিত করবেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে মনে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের কোন ধারণা পোষণ করতেন, তাহলে এইরূপ অবস্থায়, যখন তাঁর নিজেরও কোন পুত্র সন্তান ছিল না –তখন তাঁর জন্য এতে কোন অসুবিধাই ছিল না যে, তিনি আরবের সব চাইতে বড় গোত্রটির সব চাইতে বড় নেতাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে রাজি হতেন, এবং সমগ্র আরবে ঐক্য স্থাপনের রাস্তাও উন্মুক্ত করে দিতেন। কিন্ত, রসূলে করীম সল্লাল্লাহো আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি ছোট থেকে ছোট কোন জিনিসকেও নিজের বলে মনে করতেন না, তিনি কিভাবে ইসলামী এমারত বা প্রশাসনকে নিজের রাজত্ব বলে মনে করতে পারেন! তাঁর কাছে ইসলামী এমারত ছিল খোদা তা'লার আমানত। এবং সেই আমানত অটুট অবস্থায় খোদার কাছে সোপর্দ করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। অতঃপর খোদা যাকে চাইবেন, তার হাতেই তুলে দিবেন সেই আমানত। সুতরাং, তিনি (সা.) ঐ প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবং বলেছিলেন, বাজত্ব, সে তো ভিন্ন কথা, খোদার হুকুম ছাড়া আমি খেজুরের একটি ডালও তোমাকে দিতে প্রস্তুত নই।

আঁ হযরত (সা.) যখনই আল্লাহ্ তা'লার নাম নিতেন, তখনই আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠতেন। এবং মনে হতো যে, তাঁর দেহের বাইরে এবং ভেতরে-তাঁর গোটা অস্তিত্বই সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়তো। আল্লাহ্ তা'লার এবাদত করার ক্ষেত্রেও তিনি সরলতাকে এত বেশি পসন্দ করতেন যে, মসজিদের ভেতরে যেখানে কোন ফরাশ থাকতো না, কোন কাপড় বা চাদর থাকতো না, তিনি সেখানেই নামায পড়তেন এবং অন্যদেরকেও পড়াতেন। কয়েকবার এমনও হয়েছিল যে, বৃষ্টির দরুন ছাদ চুয়ে পানি পড়তো এবং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর ও কাপড় পানিতে ভিজে যেত। কিন্তু তিনি তাঁর এবাদতেই মশগুল থাকতেন, এবং তাঁর মনের মধ্যে সামান্যতম চিন্তারও উদ্রেক হতো না যে, তাঁর শরীর ও কাপড়- চোপড় বাঁচাবার জন্য নামায আপাততঃ মূলতবী রাখা দরকার কিংবা অন্য কোন জায়গায় গিয়ে পড়া দরকার। (বুখারী)

তিনি (সা.) তাঁর সাহাবাগণের এবাদতের প্রতিও খেয়াল রাখতেন । একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রা.) যিনি অত্যন্ত নেক ও পবিত্র মানুষ ছিলেন, তাঁর সর্ম্পকে তিনি (সা.) বললেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমর কতই না উন্নত মানুষ হতো, যদি সে তাহাজ্জুদ (তাহাজ্জুদ - এর নফল নামায পড়া হয়, রাত দুপুরের পর ঘুম থেকে উঠে) নিয়মমত পড়তো (বুখারী। যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) এর কানে এই কথা গিয়ে ছিলো, তখন সেদিন থেকেই তিনি (রা.) বাকায়দা তাহাজ্জুদের নামায় পড়া শুরু করে দিলেন। একই ভাবে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি (সা.) রাত্রে তাঁর জামাতা হযরত আলী (রা.) এবং মেয়ে হযরত ফাতেমা (রা.) -এর বাড়ীতে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ পড়?' হযরত আলী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! পড়বার চেষ্টা তো করি, কিন্তু যখন খোদাতাআলার ইচ্ছায় কোন কোন সময় আমাদের চোখ বন্ধই হয়ে যায়, তখন তাহাজ্জুদ বাদ পড়ে যায়।' তিনি (সা.) বললেন, 'তাহাজ্জুদ পড়বে ঠিক মত'। এই কথা বলে তিনি তাঁর ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, এবং পথিমধ্যে বার বার এই কথা আওড়াতে থাকলেন ঃ মানূষ সব সময়ই তার ত্রুটি স্বীকার করতে ভয় পায়, এবং নানান অজুহাত দেখায় নিজের দোষ ঢাকবার জন্য। উদ্দেশ্য (এই আয়াত আওড়াবার) এটাই ছিল যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.)-এর উচিত ছিল এই কথাই বলা যে, কখনও আমাদের বিচ্যুতি হয়ে যায়। কিন্তু সেকথা না বলে তাঁরা এই কথা কেন বললেন যে, যখন খোদা তা'লার ইচ্ছায় আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারি না এবং শুয়েই থাকি? এবং এই কথা বলার মাধ্যমে তারা তো নিজেদের ত্রুটিকে আল্লাহ্‌র দিকেই আরোপ করলেন !

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এইরূপ ভালবাসা সত্ত্বেও, তিনি (সা.) লোক দেখানো এবাদত এবং কষ্টকর এবাদতের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর নীতি এটাই ছিল যে, খোদা তা'লা মানুষের মধ্যে যে সকল শক্তি (Faculty) সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সেগুলির সঠিক ব্যবহারই হচ্ছে আসল এবাদত। চোখ থাকা অবস্থায় চোখ একদম বন্ধ করে রাখা কিংবা চোখ তুলে ফেলে দেওয়া এবাদত নয় বরং অপরাধ। তবে হ্যাঁ, চোখের খারাপ ব্যবহার অবশ্যই পাপ। কান-এর শ্রবণ-শক্তি যদি কোন অপারেশনের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলা হয়, তাহলে তা হবে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে শক্ত অপরাধ। তবে হ্যাঁ, অপরের নিন্দা, গিবত ও চোগলখুরী, পরচর্চা শোনা পাপ। খানা-পিনা ছেড়ে দিলে তা হবে নিজের প্রতি নিপীড়ন এবং খোদার কাছে অপরাধ। তবে, খানা-পিনার মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়া এবং অবৈধ ও অবাঞ্ছিত কিছু খাওয়াটা পাপ। এই গোটা বিষয়টিই একটি অতিব মহান শিক্ষা, যা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন দুনিয়ার সামনে। এবং যা তাঁর পূর্বে কোন নবীই পেশ করেন নি। স্বভাবজ শক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহারের নাম উত্তম চরিত্র। স্বভাবজ শক্তি নষ্ট করে ফেলা নির্বুদ্ধিতা। এগুলিকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করাই অপকর্ম। এগুলিকে যথার্থরূপে ব্যবহার করাই প্রকৃত পুণ্যকর্ম। এটাই হচ্ছে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার সারমর্ম। এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-চারিত্রের এবং তাঁর কর্মকান্ডেরও এটাই সারসংক্ষেপ।

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ 'রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিন্দেগীতে এমন কোন ঘটনা কখনই ঘটেনি যে, তাঁর সামনে যদি দু'টি উপায় খোলা থাকে, তাহলে এই দু'টির মধ্যে যে উপায়টি সহজ সরল, সেটিকে তিনি অবলম্বন করেন নি। শর্ত থাকতো শুধু একটাই যে, সেই সহজ উপায়টি অলম্বন করার মধ্যে যেন কোন প্রকার পাপ-এর আশংকা না থাকে। যদি পাপের কোন আশংকার অবকাশ থাকে, তাহলে তিনি সেই উপায় থেকে সকল মানুষের চাইতে অধিক দূরত্বে চলে যেতেন। কতই না সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং কতই না উচ্চ-স্তরের ও মর্যাদার ছিল সেই আচরণ! (মুসলিম)

দুনিয়াকে ধোকা দেয়ার জন্য কতভাবেই না অহেতুক নিজেই নিজেকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে, দুর্ভোগ দুর্দশার মধ্যে ফেলে।এই যে মানুষ নিজে নিজেই দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে পড়ে, তা কখনই খোদা তা'লার জন্য ঘটে না।

কেননা, খোদা তা'লার জন্যে তো বৃথা কোন কাজই কল্পনা করা যায় না। দুঃখ-কষ্ট এবং তকলিফের মধ্যে পড়াটা লোকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার কারণেই ঘটে থাকে। তাদের প্রকৃত পুণ্য যেহেতু কম থাকে, সেহেতু তারা ঐ মিথ্যে পুণ্য-কর্মের দ্বারা লোকদেরকে প্রভাবিত করতে চায়। এবং নিজেদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবার জন্য মানুষের চোখে ধূলো দেয়। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য তো ছিল খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং প্রকৃত পুণ্য কাজ করা। তাঁর তো লোক দেখানো এবং বানোয়াট পুণ্য-কাজের কোন প্রয়োজন ছিল না। দুনিয়া যদি তাঁকে সৎ মনে করতো তাহলেও, কিংবা দুনিয়া যদি তাঁকে সৎ মনে না করতো, তাহলেও তা ছিল তাঁর জন্য একই কথা। (এতে তাঁর কিছু যেতোও না আসতোও

না)। তাঁর লক্ষ্য তো ছিল শুধু একটাই এবং তাহলো ; আমার খোদা আমাকে কি মনে করছেন, এবং আমার নিজের প্রাণের কাছে আমার অবস্থা কী! খোদা এবং নিজের প্রাণের সাক্ষ্যের পর যদি মানুষেরাও সত্য সাক্ষ্য দিত, তাহলে তিনি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতেন। কিন্তু তারা যদি আড়-চোখে দেখতো, তাহলে তিনি তাদের দৃষ্টির অস্বচ্ছতার জন্য আফসোস করতেন। যদিও, তাদের মতামতের কোন তোয়াক্কা তিনি করতেন না।

নিজ বিবিগণের (রা.) প্রতি হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভালবাসা

আপন বিবিগণের প্রতি তাঁর (সা.) আচরণ ছিল অতিব নম্র এবং ন্যায়-ভিত্তিক। কোন কোন সময় তাঁর স্ত্রীরা (রা.) তাঁর প্রতি কঠোরতাও পদর্শন করতেন। কিন্তু, তিনি কিছু না বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। একদিনে তিনি হযরত আয়শা (রা.)কে বললেন, হে আয়শা! যখন তুমি আমার প্রতি অভিমান কর, তখন আমি ঠিকই বুঝতে পারি যে, তুমি অভিমান করেছ।' হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞসা করলেন, কিভাবে আপনি তা বুঝতে পারেন?' তিনি (সা.) বললেন, 'যখন আমার ওপরে খুশী থাক, আর কোন কারণে কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন তুমি সব সময়ই বলে থাক যে, 'মুহাম্মদ-এর খোদার কসম, আর অন্য সময় যখন কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন তুমি বলে থাক, ইব্রাহীমের খোদার কসম, কথাটা এটাই'। এই কথা শুনে হযরত আয়েশা হেসে ওঠলেন এবং বললেন 'ঠিক কথা, আপনি ঠিকই ধরেছেন'। (বুখারী)

হযরত খদীজা (রা.), যিনি ছিলেন তাঁর (সা.) বড় বিবি এবং যিনি তাঁর (সা.) জন্য বড় বড় কোরবানী করেছিলেন, তাঁর (রা.) ইন্তেকালের পরে আঁ হযরত (সা.) কয়েকটি বিয়ে বা নেকাহ্ করেছিলেন। এই বিবিরা (রা.) থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) কখনই হযরত খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের কথা ভুলে যাননি। হযরত খাদিজার (রাৎ) বান্ধবীরা যখনই আসতেন, তিনি (সা.) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুসলিম)। হযরত খাদিজার (রা.) হাতের তৈরী কোন জিনিস যদি তাঁর (সা.) সামনে এসে যেত, তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠতো।

বদর-এর যুদ্ধে তাঁর (সা.) এক জামাতা যুদ্ধ-বন্দী রূপে এসেছিলেন। মুক্তিপণ পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ তাঁর ছিল না। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মেয়ে যখন দেখলেন যে, স্বামীকে মুক্ত করে আনার মত কোন সম্পদ তাঁর কাছে নেই, তখন তিনি তাঁর মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যে হারখানি তাঁর কাছে ছিল, সেই হারখানি তিনি তাঁর স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই হারখানা যখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলো, তখন তিনি (সা.) সেই হারটি চিনতে পারলেন। তাঁর দুচোখ ভরে অশ্রু এলো। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, 'আমি আপনাদেরকে হুকুম তো দিচ্ছ না, কেননা এইরূপ হুকুম দেওয়ার কোন অধিকার আমার নেই, কিন্তু আমি জানি যে, এই হারটি যয়নব-এর কাছে ছিল তার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন রূপে। যদি আপনারা খুশী মনে এটা করতে পারেন তো আমি সুপারিশ করছি, মেয়েকে তার মায়ের শেষ চিহ্ন থেকে বঞ্চিত না করতে।" সাহাবারা (রা.) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য এর চাইতে খুশীর বিষয় আর কি হতে পারে?' তারা হারখানি হযরত যয়নব (রা.)-এর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। (হালবিয়া)

হযরত খাদিজার (রা.) কোরবানীসমূহের প্রভাব তাঁর (সা.) ওপরে এত বেশি ছিল যে, তিনি (সা.) তাঁর অন্য বিবিদের (রা.) সামনে প্রায়শঃ তাঁর (রা.) কোন কোন পুণ্যকাজের বর্ণনা করতেন। এভাবেই একদিন তিনি (সা.) হযরত আয়েশার (রা.) সামনে হযরত খাদিজার (রা.) কোন নেকীর অর্থাৎ পুণ্যকাজের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এতে হযরত আয়েশা খানিকটা গোশ্বা করেই বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি ওই বুড়ীর স্মৃতিচারণ ছেড়ে দিন তো! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তো তার চাইতে উত্তম জওয়ান ও সুন্দরী স্ত্রীদেরকে দিয়েছেন? এক কথা শুনে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবেগে উত্তেজিত হয়ে ওঠলেন এবং বললেন, 'আয়েশা, তুমি ধারণাই করতে পারবে না যে, খাদিজা আমার জন্য কী করেছে (বুখারী)।

ইনসাফ বা সুবিচার

ইনসাফ ও আদালত–(সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা) –তাঁর (সা.) মধ্যে এত বেশী ছিল যে, তার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। আরবে স্বজনপ্রীতি এবং সুপারিশ গ্রহণ করা ছিল এক প্রকার সাধারণ বা সংক্রামক ব্যাধি। আরবের কথা তো আছেই, সে যুগেই সুসভ্য দেশগুলিতেও দেখা যেত যে,বড় বড় লোকদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপরে সবাই ইতস্ততঃ করতো, ভয় পেতো ; কিন্তু গরীবদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ ভয় পেত না। একবার এক মকদ্দমা এলো তাঁর (সা.) কাছে। খুব বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মহিলা অপর লোকের জিনিষ নিয়ে গিয়েছিল (চুরি করেছিল), যখন বিষয়টা জানা জানি হয়ে গেল, তখন আরবদের মধ্যে দারুন টেন্‌শন ও উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কেননা এতে করে, অনেক বড়, সম্মানিত এক খান্দানের বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তারা চাইলো যে, তারা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এই দরখাস্ত পেশ করবে, যেন এই মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, কিন্তু কেউ সাহস পেল না। তবে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক স্নেহের পাত্র আসমা বিন যায়েদকে (রা.) লোকেরা খুব করে ধরলো, যেন তিনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে ঐ মহিলার জন্যে সুপারিশ করেন। আসমা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে কথাটা পাড়তে না পাড়তেই তাঁর (সা.) চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠলো, এবং তিনি বললেন, আসমা! তুমি এটা কী বলছো! অতীতের জাতিগুলি তো এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা বড় লোকদের খাতির করতো এবং গরীবদের প্রতি যুলুম করতো। ইসলামতো এসবের কোন অনুমতি দেয় না। এবং আমি তো এটা কোন মতেই করতে পারবো না। আল্লাহ্‌র কসম! যদি

আমার মেয়ে ফাতেমাও এ ধরনের অপরাধ করতো, তাহলে তাকেও আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়তাম না। (বুখারী)

এই ঘটনাও ইতোপূর্বে তার জীবনী (নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা-স.) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর-এর যুদ্ধে যখন হযরত আব্বাস (সা.) বন্দী হয়ে এসেছিলেন এবং বন্দী অবস্থায় কষ্টে কাৎরাচ্ছিলেন, তখন তিনিও (সা.) মনে মনে দারুন কষ্ট পাচ্ছিলেন। সাহাবারা তাঁর এই মনোকষ্ট লক্ষ্য করে যখন হযরত আব্বাসের (রা.) হাতের বাঁধন খুলে দিলেন এবং বিষয়টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, আমার আত্মীয় যেমন, অন্যদের আত্মীয়রাও তেমনি। হয় তোমরা আমার চাচা আব্বাসকে পুনরায় রশি দিয়ে বাঁধো, নয়তো সকল বন্দীদের বাঁধান খুলে দাও।' সাহাবারা (রা.) যেহেতু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মনোকষ্টের কারণ অনুভব করতে পারছিলেন, সেহেতু তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কড়া পাহাড়া লাগাব। কাজেই আমরা সমস্ত বন্দীর বাঁধন খুলে দিচ্ছি।' অতঃপর প্রত্যেকটি বন্দীর বাঁধন তাঁরা খুলে দিলেন।

তিনি (সা.) যুদ্ধের সময়েও সুবিচার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। একবার তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন খবরাখবর সংগ্রহের জন্য। শত্রুপক্ষের কিছু লোকের সঙ্গে তাঁরা মুখোমুখি হলেন পবিত্র মাসের (রজব-এর) শেষ তারিখে। সাহাবারা মনে করলেন যে, আমরা যদি এদেরেকে জীবিত ছেড়ে দেই, তাহলে এরা ফিরে গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে খবর দিবে, এবং আমরা মারা পড়বো। কাজেই তাঁরা (রা.) ওদের ওপরে হামলা চালালো। ফলে, তাদের মধ্যে একজন এই যুদ্ধে মারা গেল। যখন এই খবর সংগ্রহকারী কাফেলাটি মদীনা ফিরে এলো, তখর তাদের পিছে পিছে মক্কাবাসীদের তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল এই অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো যে, এরা পবিত্র মাসের মধ্যে আমাদের দুজন মানুষকে হত্যা করেছে। অথচ এই লোকগুলিই পবিত্র মাসের মধ্যেও সব সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের ওপরে অত্যাচার চালিয়েছিল। কাজেই, তাদের তো এই জবাবই পাওয়ার কথা যে, তোমরা কবে পবিত্র মাসের সম্মান দেখিয়েছ যে, তোমরা আমাদের কাছে এই সম্মানের দাবী করছ? কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম সেই জবাব দিলেন না, বরং বললেন, 'হাঁ, বে ইনসাফী হয়ে গেছে। কেননা, এটা সম্ভব যে ওরা হয়তো মনে করেছিল যে, ওরা পবিত্র মাসের মধ্যে আক্রান্ত হবে না। কাজেই, ওরা হয়তো আত্মরক্ষার তেমন চেষ্টাও করেনি। ফলে, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে গেছে।' যাহোক,তিনি (সা.) আরবের প্রথা অনুযায়ী সেই হত্যার জন্য রক্তপণ আদায় করে দিলেন ওদের উত্তরাধিকারীদের কাছে।

[মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.) পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের জন্য হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া ঃ

"যেসব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন, তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের ওপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকালে তাঁর সে সব বান্দাদের সাথে তাদেরকে উত্থিত করুন, যাদের ওপরে তাঁর অনগ্রহরাজি ও করুণা-ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ-যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান করো। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন!"

(মজমুয়ায়ে ইশতিহারাত, ১ম খন্ড, পৃ-৩৪২)।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিক নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব

আব্দুল গনী জাহাঙ্গীর খান, ইনচার্জ, ফ্রেঞ্চ ডেস্ক, লন্ডন
বার্ষিক জলসা, জার্মানী, ২০১৩-এ প্রদত্ব বক্তৃতা

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿۸۹﴾

(সূরা বনী ইস্রাঈল:৮৯)

এই আয়াতের অনুবাদ হল: 'তুমি বল, সব মানুষ এবং জ্বিনও যদি এই কুরআনের অনুরূপ কিছু নিয়ে আসার জন্য একত্র হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ কোনো কিছু আনতে পারবে না, এমন কি তারা একে অপরের সাহায্যকারী হলেও (তা আনতে পারবে না)।'

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী! আপনারা শুনেছেন, আমার বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে, পবিত্র কুরাআনের অলৌকিক নিদর্শনাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব।

পবিত্র কুরআনের সীমাহীন ও অনবরত প্রকাশিত অলৌকিক নিদর্শন কোনো একটি বক্তৃতায় তো নয়ই বরং একলক্ষ বক্তৃতায়ও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বে এ কথাটি সুস্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার বিষয়টির মধ্যেই এক মহা নিদর্শন রয়েছে।

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই মোজেযা বা নিদর্শন বর্ণনা করছেন যে, কোন্ অবস্থা বা পরিস্থিতিতে আর কেমন মানুষের ওপর এটি অবতীর্ণ হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, 'পবিত্র কুরআনে যতবেশী ধর্মীয়-জ্ঞানের সূক্ষ্ম-সতত্ত্যতা এবং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন জ্ঞান আর সত্য-অর্জনের জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াও অনেক অজানা তথ্য বা গোপন রহস্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। যদিও এসব কিছু নিজের ভেতর এমন বৈশিষ্ট্য রাখে, যার কারণ পরিপূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটনে মানবীয়-শক্তি অক্ষম। আর কোনো জ্ঞানীর জ্ঞান এসব উদঘাটনে নিজ থেকে কিছুই করতে পারে না।

কেননা, পূর্ব-যুগের প্রতি দৃষ্টিপাতে এটি প্রমাণ হয়ে গেছে যে, অতীতের কোনো বিজ্ঞ-দার্শনিক সেসব জ্ঞান ও তত্ত্ব বা দর্শন উদঘাটন করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু এক্ষেত্রে অবাক করার মত বিষয় হচ্ছে, সেই তত্ত্ব ও জ্ঞান এমন এক নিরক্ষর ব্যক্তিকে দান করা হয়েছে, যিনি কেবল লেখা-পড়াই যে জানতেন না তা নয়, বরং তিনি কোনো শিক্ষালয়ের চেহারা পর্যন্ত দেখেন নি এবং কোনো বইয়ের একটি অক্ষরও পড়েন নি। এছাড়াও কোনো জ্ঞানী ও বিজ্ঞ-ব্যক্তির সাহচর্যও পান নি।

বরং পুরো জীবনই কাটিয়েছেন জংলী আর অসভ্য লোকদের মাঝে। তাদের সংস্পর্শেই লালিত-পালিত হয়েছেন আর তাদের ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছেন এবং

তাদের সঙ্গেই মিলেমিশে ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর উম্মী ও নিরক্ষর হওয়া এমন একটি প্রাঞ্জল-বিষয় যা কোনো ইসলামী ঐতিহাসিকের অজানা নয়।' (বারহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ৫৬১-৫৬৩)

কুরআন শরীফ সেই পবিত্র গ্রন্থ এবং এমন সত্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ যে, বিশ্বের অন্য কোনো গ্রন্থ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এটিও সেসব অলৌকিক নিদর্শনের অন্যতম যে, আজ পর্যন্ত এর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নি।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেন, 'কুরআন শরীফ হচ্ছে সেই গ্রন্থ, যা তার স্বীয় মাহাত্ম্য, নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিজের সত্যতা, নিজের রচনাশৈলীর সৌন্দর্য, শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গী এবং নিজের আধ্যাত্মিক আলোকরাশি সম্পর্কে নিজেই দাবী করেছে। এবং সেই সঙ্গে নিজের তুলনাবিহীন হওয়ার কথাও নিজেই প্রকাশ করেছে।

একথা কখনোই ঠিক নয়, কেবল মুসলমানরাই শুধু তাদের ধারণার বশবর্তী হয়ে এই গ্রন্থের গুণাবলীর কথা বা উৎকর্ষের বিষয়টি প্রকাশ করেছে। বরং এই কিতাব স্বয়ং নিজের উৎকর্ষতার কথা, পূর্ণতার কথা ও সৌন্দর্যের কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। এবং এটি স্বীয় অনন্য-সাধারণ হওয়ার এবং অতুলনীয় হওয়ার বিষয়টি পুরো সৃষ্টির মোকাবিলায় উপস্থাপন করে চলেছে। এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা দিচ্ছে, আছে কি কোথাও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী? এর সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী এবং সত্যতা মাত্র দু'তিনটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তা হলে, অজ্ঞ বা মুর্খরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।

বরং এর সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী তো উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত এবং এ হচ্ছে তারাভরা আকাশের ন্যায়, যেদিকেই তাকাও না কেন, সেদিকেই জ্যোতির বিচ্ছুরণ দেখতে পাবে। এমন কোনো সত্যতা নেই যা এর বাইরে আছে। এমন কোনো জ্ঞান নেই, প্রজ্ঞা নেই, যা এর সর্বব্যাপী বর্ণনার অভ্যন্তরে নেই, এমন কোনো নূর বা জ্যোতি নেই, যা এর আনুগত্য করে লাভ করা যায় না। এবং এগুলো শুধু কথার কথাই নয় আর অপ্রমাণিতও নয়। এমন কোনো বিষয় নেই, যা শুধু মৌখিক দাবীতেই সীমাবদ্ধ। বরং তা সবই যাচাইকৃত এবং এর সত্যতা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত। কেননা, তা সবই বিগত তেরশ' বছর ধরে আপন জ্যোতির্মালা ক্রমাগতভাবে প্রকাশ করে চলেছে। আমরাও সেসব সত্যতার কথা এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

আমরা কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী এবং মা'রেফত এমনভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, তা যে কোনো সত্যান্বেষীকে সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি দান করার জন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠছে। এটি কীভাবে সম্ভব, একজন মানুষ নিজের মনগড়া কথা দ্বারা এই পূর্ণাঙ্গ নূর বা জ্যোতির শান বা মহিমা বর্ণনা করে?

কিন্তু কারো মনে যদি এই ধারণা জন্মে, এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও বিশেষ দর্শন, যা পবিত্র কুরআন হতে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে, তা অন্য কোনো গ্রন্থ হতেও সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহলে বিতর্ক সমাধানের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে সেই গ্রন্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও বিশেষত্ব উপস্থাপন করা, এবং যেভাবে পবিত্র কুরআন সকল ভ্রান্ত মতাদর্শ খন্ডনে সমৃদ্ধ, আর যেভাবে সেই পবিত্র কালাম বা বাণী প্রতিটি বিষয়কে যুক্তিযুক্ত বা অকাট্য দলীল দ্বারা সত্য সাব্যস্ত করে, আর যেভাবে এই পবিত্র গ্রন্থে ঐশী তত্ত্ব ও দর্শন বর্ণিত আছে, আর যেভাবে এতে হৃদয়ের জ্যোতি সম্পর্কে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা আমরা এই পুস্তকের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছি, তা নিজেদের পুস্ত থেকে লিখে দেখান।' (বারাহীনে আহমদীয়া, টিকা, পৃঃ ৬৬২-৬৬৭)

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের সীমাহীন তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের উৎস হওয়া এবং অত্যাধুনিক জ্ঞান ও তত্ত্ব উদঘাটন করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'জানা প্রয়োজন, পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট-মাহাত্ম্য যা প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক ভাষাভাষির নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা উপস্থাপন করে আমরা প্রত্যেক দেশের মানুষকে, তা সে হিন্দুস্থানী হোক, পার্সী হোক, ইউরোপীয়ান হোক, আমেরিকান বা অন্য যে কোনো দেশের অধিবাসী হোক না কেন, সবাইকে নির্বাক করে দিতে পারি। আল্ কুরআনের সেই সীমাহীন মা'রেফত বা সুক্ষ্মতত্ত্বাবলী, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রত্যেক যুগেই সে যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রকাশিত বা উন্মোচিত হয়েছে, এবং প্রত্যেক যুগের ভ্রান্ত চিন্তাকে প্রতিহত করার জন্য সশস্ত্র সৈনিকের ন্যায় দণ্ডায়মান রয়েছে।

যদি পবিত্র কুরআন নিজ সত্যতা এবং তত্ত্বাবলীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কোনো গ্রন্থ হতো, তাহলে একে কোনমতেই পূর্ণ মো'জেযা বা নিদর্শন বলা যেত না। শুধু রচনাশৈলীর সৌন্দর্য এমন বিষয় হতে পারে না– যার অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিনা-ব্যতিক্রমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে মুগ্ধ করতে পারে। এর সুস্পষ্ট মো'জেযাটি হচ্ছে, এর অভ্যন্তরে রয়েছে অন্তহীন মা'রেফত ও সুক্ষ্মতত্ত্ব ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা। যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের এই অলৌকিক নিদর্শনকে অস্বীকার করে, সে কুরআনী জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যে ব্যক্তি আল্ কুরআনের এই মো'জেযায় বিশ্বাসী নয়, সে কুরআন করীমের উচ্চ-অবস্থান সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না, সে খোদাকেও সেভাবে চিনতে পারে না যেভাবে তাকে চেনা উচিত, সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কেও সেভাবে সম্মান করতে পারে না, যেভাবে তাঁকে সম্মান করা উচিত।

হে খোদার বান্দারা! নিশ্চিতরূপে মনে রেখো, পবিত্র কুরআনের অনন্ত ও অফুরন্ত মা'রেফত ও সত্যতা ও তত্ত্বাবলীর অলৌকিকত্ব এত সফল ও পরিপূর্ণ-নিদর্শন যে, তা প্রত্যেক যুগেই তরবারির চাইতে অনেক বেশি কাজ করেছে, অধিক শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগে নিত্য-নতুন অবস্থার প্রেক্ষাপটে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির দাবী করা হয়েছে, তা সব কিছুরই ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে, সেগুলোকে খণ্ডন করে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়েছে আল্ কুরআন। এবং অনুরূপ সবকিছু মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে পবিত্র কুরআনে। যে কোনো ব্যক্তি, তা তিনি ব্রাহ্মণ কিংবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীই হোন বা আর্যই হোন, বা অন্য যে কোনো

দর্শনের অনুসারীই হোন না কেন, এমন কোনো ঐশী- সত্যতা প্রদর্শন করতে পারবেন না, যা আল্ কুরআনে সংরক্ষিত নেই। পবিত্র কুরআনের রহস্য বা বিস্ময়সমুহ অশেষ। এই গ্রন্থের বিস্ময়কর রহস্যাবলীর উদ্‌ঘাটন যেমন বিশেষ কোনো যুগে শেষ হয়ে যায়নি, বরং নতুন নতুন অবস্থার প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েই চলেছে, তেমনি এই পবিত্র-গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন করীমের অবস্থাও তদ্রুপ। এতেকরে এটিও প্রমাণ হয়, খোদা তা'লার কথা ও কাজের মধ্যে কোনো বিরোধ বা কোন অসামঞ্জস্য নেই।

আমি ইতোপূর্বেও লিখেছি, পবিত্র কুরআনের রহস্যাবলী প্রায়ই আমার কাছে ইলহাম (ঐশীবাণী) যোগে প্রকাশ করা হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হয়, তফসীর গ্রন্থগুলিতে সেগুলির নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই অধমের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত যে সময় কেটে গেছে, তার হিসাব নিহিত আছে সূরাতুল আসর-এর অক্ষরসমূহের গাণিতিক মানের মধ্যে, এবং সেই সময়কাল হচ্ছে ৪৭৪০ (চার হাজার চারশত চল্লিশ) বছর।

এখন বল তো! এই যে কুরআনী সূক্ষ্মতত্ত্ব, যার মধ্য দিয়ে পবিত্র কুরআনের একটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, তা কোনো ভাষ্য বা তফসীরে লিখিত আছে কি-না? এমনিভাবে, খোদা তা'লা আমার ওপর কুরআনী মা'রেফতের এই সুক্ষ্মতত্ত্বও উন্মোচিত করেছেন যে,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١

(নিশ্চয় আমরা ইহা অবতীর্ণ করেছি লায়লাতুল কদর এ (ফয়সালার রাত্রিতে- সূরা আল্ কদর: ২), এর অর্থ শুধু এতটুকুই নয় যে, সে ছিল এক বরকতের রাত, যে রাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। বরং এই অর্থ ছাড়াও, এই আয়াতের অভ্যন্তরে আরও একটি অর্থ নিহিত আছে, যা আমি আমার পুস্তিকা ফতেহ্ ইসলাম-এর মধ্যে বর্ণনা করেছি, যা সঠিক অর্থও বটে ।

এখন বল, এই সমস্ত সত্য ও সূক্ষ্ম মা'রেফত কোন্ তফসীরে লিপিবদ্ধ আছে? আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের কোনো কথার একটি অর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি দ্বিতীয় কোনো অর্থ করা হয়, তাহলে এই উভয় অর্থের মধ্যে না কোনো পরস্পর-বিরোধ সৃষ্টি হয়, না এতে কুরআনী হিদায়াত ও তাৎপর্যের মধ্যে কোনো তারতম্য ঘটে।

বরং তা এক আলোর সঙ্গে আর এক আলোর মিলনে কুরআনের মাহাত্ম্যকে আরো বেশি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করে। এবং যেহেতু সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে অগণিত চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব ঘটেছে, সেহেতু নতুন পদ্ধতিতে নতুন নতুন জ্ঞান প্রকাশ করে সমস্ত নতুন নতুন বি'দাত বা উদ্ভাবনা প্রভৃতি খন্ডন বা বাতিল সাব্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায় এই গ্রন্থ, যা কি-না খাতামুল কুতুব (কেতাবসমূহের মোহর) হওয়ার দাবী করে, তা যদি যুগের প্রতিটি অবস্থার তদারকি না করে, তাহলে সেটি কোনো ভাবেই 'খাতামুল কুতুব' হওয়ার দাবী করতে পারে না। আর যদি এই কিতাবের মধ্যে গুপ্তভাবে সেসব বিষয় বিদ্যমান থাকে, যা প্রত্যেক যুগের প্রতিটি অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন, তাহলে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে, কুরআন নিঃসন্দেহে অফুরন্ত জ্ঞান দ্বারা ভরপুর এবং প্রত্যেক যুগের জন্য যথোপযুক্ত সমাধান দিতে সক্ষম, প্রতিটি যুগের প্রতিটি অবস্থার তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম।

এখন একথাও মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার নিয়ম হচ্ছে, তিনি প্রত্যেক কামেল মুলহেম বা ঋদ্ধ ঐশীবাণী-প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে কুরআনের গুপ্ত রহস্যাবলী উন্মোচিত করে থাকেন। বরং কোনো কোনো সময় তিনি কোনো মুলহেম-এর হৃদয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত ইলহামের আকারে অবতীর্ণ করে থাকেন। এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই আয়াতের পূর্বের অর্থ ছাড়া নতুন আর এক অর্থ প্রকাশ করে দেওয়া।

যেমন, মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব (মরহুম) গযনবী তাঁর এক পত্রে লিখেছেন, আমার প্রতি একবার ইলহাম হলো,

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا

(আমরা বললাম, হে আগুন! শীতলতা ও নিরাপত্তার উপায় হয়ে যাও (সূরা আল্ আম্বিয়া:৭০) কিন্তু, এর অর্থ কি, তা আমি বুঝিনি। পুনরায় ইলহাম হলো, 'নার' এর পরিবর্তে 'সবর' শব্দ যুগ হবে, তখন আমি বুঝলাম, আগুন বলতে এখানে ধৈর্যকে বুঝানো হয়েছে।' (ইযালায়ে আওহাম, পৃ: ২৫৫-২৬২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের মো'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শনের চারটি ধরন বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, 'পবিত্র কুরআন মো'জেযা, এবং অতি-প্রাকৃতিক বা অনন্য-সাধারণ নিদর্শনাবলী চার প্রকারঃ ১, আক্‌লী বা বুদ্ধি সংক্রান্ত মো'জেযা ২, ইল্‌মী বা জ্ঞান-সম্বন্ধীয় মো'জেযা ৩, রূহানী বারাকাত বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ সম্পর্কীয় মো'জেযা এবং ৪, অতি-প্রাকৃতিক বা খুবই অসাধারণ বিষয়াবলী সম্পর্কিত মো'জেযা।

১, ২, ও ৩ নাম্বার মো'জেযাগুলি কুরআন শরীফের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো অতীব মর্যাদামণ্ডিত এবং প্রকাশ্য-প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত। এগুলোকে প্রত্যেক যুগেই প্রতিটি মানুষ প্রকাশ্য বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু ৪ নম্বর মো'জেযা, যা কিনা অতি-প্রাকৃত বা বহির্বিষয়াদি সম্পর্কিত, তার সঙ্গে কুরআন শরীফের কোনো অন্তর্নিহিত বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এর মধ্যেই পড়ে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ এর মো'জেযা। কুরআন শরীফের প্রকৃত-মর্যাদা, ঔৎকর্ষ এবং সৌন্দর্য প্রথম তিন শ্রেণীর মো'জেযার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বরং প্রতিটি কালামে-ইলাহী বা আল্লাহ্‌র বাণীর মহিমান্বিত নিদর্শন হচ্ছে, এর মধ্যে এই তিন শ্রেণীর মো'জেযা দেখতে পাওয়া যায়। এবং পবিত্র কুরআনে এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটি নিদর্শনকেই পাওয়া যায় অতীব পূর্ণতার সঙ্গে ও উত্তমরূপে। এগুলোকে কুরআন শরীফ স্বীয় অতুলনীয় ও অনন্য সাধারণ হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বার বার উপস্থাপন করেছে। যেমন বলা হয়েছে,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٩﴾

তুমি বল, যদি সকল মানুষ এবং জিন্ এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনবার জন্য সমবেত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনতে সক্ষম হবে না, যদি তারা একে অপরের সাহায্যকারীও হয়। (সূরা বণী ইস্রাঈল: ৮৯)

অর্থাৎ, ঐসব অস্বীকারকারীকে বলে দাও, যদি সমস্ত জিন্ ও ইনসান অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিই এ ব্যাপারে ঐকমত হয়ে যায় যে, এই কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে হবে, তাহলে কোনো ক্রমেই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তারা সক্ষম হবে না এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করতে, যার মধ্যে অনুরূপ প্রকাশ্য ও গুপ্ত উৎকর্ষতা বিদ্যমান থাকবে। এমনকি, এ ব্যাপারে তারা সবাই একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করলেও (তা করতে সক্ষম হবে না)। পুনরায় অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

(অর্থ: আমরা এই কিতাবে কোনো বিষয়ই বাদ দেইনি- সূরা আল্ আনআ'ম: ৩৯– অনুবাদক) অর্থাৎ, এই গ্রন্থে (পবিত্র কুরআন) ধর্মীয় বিষয় বহির্ভুত কোনো বিষয় নেই, বরং এটি সকল প্রকার ধর্মীয় তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ বিষয়াবলীর আধার। পুনরায় আরেকস্থলে বলা হয়েছে,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

(সূরা আন নাহল: ৯০)

অর্থাৎ, আমরা সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে এই গ্রন্থ (পবিত্র কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। আবার বলা হয়েছে,

يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٣﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٤﴾

(সূরা আল্ বায়্যিনাহ্:৩-৪) অর্থাৎ, এই কুরআন শরীফ হচ্ছে সেসব পবিত্র পৃষ্ঠার সমাহার, যা সকল ঐশী গ্রন্থের সারবস্তু ও সারমর্মে ভরপুর।

এরপর আল্লাহ্ বলেন,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

(সূরা আল্ বাকারা: ২৪-২৫)

অর্থাৎ, হে অস্বীকারকারীরা! যদি তোমরা এই বাণী সম্পর্কে, যা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, কোনো সন্দেহ পোষণ কর– অর্থাৎ যদি তোমরা একে খোদার বাণী মনে না করো এবং এমন গ্রন্থ রচনা করা মানুষের সাধ্যে রয়েছে বলে মনে করো, তাহলে তোমরা এরূপ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ একটি সূরা রচনা করে উপস্থাপন করো। কিন্তু, যদি তোমরা এমনটি রচনা করতে না পারো, আর স্মরণ রেখ যে, কখনোই রচনা করতে পারবে না, তাহলে সেই অগ্নিকে ভয় কর, যার ইন্ধন হচ্ছে পাথর (প্রতিমা) এবং মানুষ। অর্থাৎ প্রতিমা, মুশরীক এবং অবাধ্য লোকেরাই এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার কারণ হয়। যদি এই পৃথিবীতে প্রতিমা পূজা, শির্ক, অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা না থাকতো, তাহলে সেই অগ্নিও প্রজ্জ্বলিত হতো না।

মোটকথা, এসবই হচ্ছে এর ইন্ধন বা জ্বালানীর উপকরণ। পুনরায় একস্থানে বলেন,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٢﴾

(সূরা আল্ হাশর: ২২)

অর্থাৎ এই কুরআন, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যদি কোনো পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করা হতো, তাহলে তা বিনয় ও খোদার ভয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত, আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা এজন্য বর্ণনা করছি, যাতে মানুষ ঐশী-বাণীর মাহাত্ম্য অনুধাবনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে। এগুলো হচ্ছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সেসব নিদর্শনের বিবরণ, যা স্বয়ং এর মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এছাড়াও, অতি-প্রাকৃত বা বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কিত বহু নিদর্শনের কথাও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর এ ধরনের নিদর্শন হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্যের জন্য ঠিক সেরকম অলংকার বিশেষ, যা শোভা বর্ধনের জন্য পড়ানো হয়। কিন্তু, যা এমনিতেই সুন্দর, তা অন্য কোনো অলংকারের মুখাপেক্ষী নয়, যদিও তা সৌন্দর্যের ছটা কিছুটা বৃদ্ধি করে বটে।

এক্ষেত্রে জানা আবশ্যক, বহির্বিষয়াদি বা অতি-প্রাকৃত মো'জেযাগুলি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ বহু বিস্ময়কর ঐশী-সাহায্য ও সমর্থনের কথা বর্ণিত আছে পবিত্র কুরআনে, যার প্রত্যেকটিই ছিল অলৌকিক ঘটনা। এবং এগুলি সংঘটিত করার উদ্দেশ্য ছিল মূলত এটিই, আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, তিনি তাঁর নবী (সা.)-কে মিসকীনী, গরীবি এবং এতীমি এবং অসহায় এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবির্ভূত করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, মাত্র ত্রিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর বুকে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। এবং তিনি তাকে (সা.) কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং সিরিয়া, মিশর এবং দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী দেশসমূহের রাজা-বাদশাহ্‌র ওপরে বিজয় দান করবেন।

তিনি তাই ঐ অল্প কালের মধ্যেই তাঁর (সা.)-এর বিজয়কে আরব উপদ্বীপ থেকে নিয়ে সুদুর জিহুন (ওক্সাস) নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এবং এই সমস্ত দেশেরই ইসলাম গ্রহণের কথা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বলা হয়েছিল কুরআন শরীফে। সেই নিঃসম্বল অবস্থা (মুসলমানদের) এবং পরবর্তীতে তাদের সেই সব অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর বিজয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিজ্ঞ এবং শিক্ষিত ইংরেজরাও এই সাক্ষ্য প্রদান করেছে, যত দ্রুততার সঙ্গে ইসলামী-রাজত্ব এবং ইসলাম পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার উপমা পৃথিবীর ইতিহাসে

‘কুরআন শরীফ হচ্ছে সেই গ্রন্থ, যা তার স্বীয় মাহাত্ম্য, নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিজের সত্যতা, নিজের রচনাশৈলীর সৌন্দর্য, শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গী এবং নিজের আধ্যাত্মিক আলোকরাশি সম্পর্কে নিজেই দাবী করেছে। এবং সেই সঙ্গে নিজের তুলনাবিহীন হওয়ার কথাও নিজেই প্রকাশ করেছে।

কোথায়ও নেই’। প্রকাশ থাকে, যে ঘটনার কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না, তাকেই অন্য কথায় বলা হয় মো’জেযা বা অলৌকিক নিদর্শন। সংক্ষেপে, মানবীয় ক্ষমতা-বহির্ভূত বিষয়াদির মধ্যে পরিবর্তন সাধন, যা কি-না মো’জেযা বা অলৌকিক ঘটনা, তার নানা বিবরণ রয়েছে কুরআন শরীফে। বরং যদি একটু চোখ খুলে দেখ, তাহলে দেখতে পাবে, এই পবিত্র-বাণীর প্রত্যেকটি স্থান থেকেই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে ঐশী- সমর্থনের ধ্বনি।’ (সুরমা চশমা আরিয়া, টিকা, পৃ: ৬০-৬৭)

পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালার ওপর অনুশীলনকারীদের ঐশী-সাহায্য ও সমর্থনের বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার নিয়ামত বা সম্মান দান করা হয়। গোটা ইসলামের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী, প্রত্যেক যুগেই সহস্র সহস্র পুণ্য-প্রকৃতির মুসলমান আউলিয়া, যারা পবিত্র কুরআনের আশিস-দ্বারা স্বীয়-আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন, তাদেরকে এমনসব নিদর্শন ও দোয়া গৃহীত হবার বিস্ময়কর মো’জেযা দেখানো হয়েছে যে, এসব ঘটনা পাঠকদের হৃদয় ঈমানের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ না করে পারে না। এমন ঘটনা অগণিত। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, আর এর মাধ্যমেই অধমের বক্তৃতা শেষ হবে। যুগ মসীহ্ হযরত (আ.)-এর প্রবীণ সাহাবী হযরত মৌলভী গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সা’দউল্লাহ্ পুরের ঘটনা।

সা’দউল্লাহ্পুর আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ লোক হানাফী মতবাদের অনুসারী ও আমাদের বুযূর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখতেন। এজন্য আমি কখনো কখনো সেই গ্রামে তবলীগের উদ্দেশ্যে যেতাম, আর তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা বুঝানোর চেষ্টা করতাম। এই গ্রামে মৌলভী গওস মোহাম্মদ সাহেব নামের একজন আহলে হাদীস আলেম ছিলেন, আর অমৃতসরের গযনবী পরিবারের সঙ্গে শিষ্যত্বের সম্পর্কের কারণে তিনি আহমদীয়াতের চরম শত্রু ও বিরোধী ছিলেন। একদিন আমি তার উপস্থিতিতে মসজিদে লোকদেরকে আহমদীয়াত সম্পর্কে তবলীগ করি এবং তাকেও সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি পুস্তক-পত্রিকা পড়ার জন্য দেই।

এই তবলীগ এবং হুযূর আকদাসের বই-পুস্তকের মাধ্যমে যখন তিনি জানতে পারেন, আমি হযরত মির্যা সাহেবকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হিসেবে মান্য করি, তখন তিনি আমার সম্পর্কে অশ্লীল কথা-বার্তা বলতে আরম্ভ করেন আর সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কেও নোংরা কথাবার্তা বলেন। আমি তার ভালোর জন্যই তাকে বুঝানোর চেষ্টা করি, আপনি যত ইচ্ছে আমাকে গালী-গালাজ করুন, কিন্তু হযরত আকদাস (আ.)-এর অসম্মান করবেন না, কিন্তু সে এথেকে বিরত হয় না।

পরিশেষে কোনো উপায় না দেখে আমি নিভৃতে গিয়ে সিজদায় পতিত হই আর কেঁদে কেঁদে খোদার দরবারে দোয়া করি এবং রাতের বেলা খাবার না খেয়েই মসজিদে এসে ঘুমিয়ে পড়ি। যখন সেহেরীর সময় নিকটবর্তী হয়, তখন মৌলভী গওস মোহাম্মদ সাহেব মসজিদে আমার কাছে আসে আর ক্ষমা চেয়ে আমাকে বলতে থাকে, খোদার খাতিরে এখনই হযরত মির্যা সাহেবকে আমার বয়আতের পত্র লিখুন, নতুবা আমি এখনই মরে যাবো আর দোযখে নিক্ষিপ্ত হবো। আমি হঠাৎ আহমদীয়াতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখে আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করি।

মৌলভী সাহেব বলেন, রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, ‘যেন কিয়ামতের দিন আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা পালনের জন্য চরম ভয়ানক আকৃতির এক ফিরিশ্‌তা এসেছে। এবং তার কাছে আগুন দিয়ে বানানো বড় বড় মুগুর রয়েছে, যেগুলোর উচ্চতা আকাশ পর্যন্ত। সে আমাকে ধরে ফেলে আর বলে, তুমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং যুগ-ইমামের মর্যাদা হানী করে জঘন্য অপরাধ করেছ, তাই এখন দোযখের দিকে চল এবং এর শাস্তি ভোগ কর।

আমি ভয়ে ভয়ে তার সমীপে নিবেদন করি, আমি তওবা ও অনুশোচনা করছি, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। তিনি বলেন, এখন ত্বরা করছ কেন? এরপর আমাকে মারার জন্য তার মুগুর ওঠায়, যার ভীতিপ্রদ আকৃতি দেখেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন আর হযরত মির্যা সাহেবের সমীপে আমার বয়আতের পত্র লিখে দিন। অতএব, এই স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি আহমদী হন এবং এরপর আমাদের দু’জনের তবলীগে সেই গ্রামের অধিকাংশ নারী-পুরুষ আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। ফালহামদুলিল্লাহি আলা যালিক।

এ হচ্ছে সেসব মহান নিদর্শন, যা আহমদীয়া জামাত আজও বিশ্ববাসীকে দেখাচ্ছে। পবিত্র কুরআন সেই আশিসপূর্ণ গ্রন্থ, যার অলৌকিক-নিদর্শনাবলীর ধারা সর্বদাই বহাল থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। পরম দয়ালু খোদা আমাদের সবাইকে এই মহান গ্রন্থ হতে পুরোপুরি উপকৃত হবার এবং এর কল্যাণে ভূষিত হবার তৌফিক দিন, আমীন। ওয়া আখিরুদ্ দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**
ওয়াকফে যিন্দেগী। বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

প্রত্যহ দরূদ শরীফ পাঠের বরকত এবং তওবা ও এস্তেগফার

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর ওপর রহমত (দরূদ) নাযেল করেছেন এবং ফিরিশ্‌তারাও (তাঁর জন্য রহমত কামনা করছে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর জন্য রহমত কামনা কর (দরূদ পাঠ কর) এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। (সূরা আহযাব : ৫৭)

এই আয়াতে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করেছেন এবং মু'মিনগণকে তিনি "দরূদ" পাঠের অর্থাৎ রাসূলের (সা.) এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রহমত প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ফিরিশ্‌তাগণও এই নবীয়ে করীম (সা.) এর প্রতি রহমত কামনা বা দরূদ পাঠ করছেন।

সাহাবায়ে কেরাম হযরত নবীয়ে আকরাম (সা.)-এর নিকট জানতে চেয়েছেন যে, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা কি প্রকারে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব। হুযূর (সা.) উত্তরে বলেছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা বল :

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্না কা হামীদুম মাজিদ।

আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

অনুবাদ : হে আল্লাহ্! তুমি অনুগ্রহ ও আশীষ বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর (সা.) এর অনুসারীদের প্রতি, যেমন তুমি অনুগ্রহ ও আশীষ নাযিল করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংসিত ও মহামর্যাদাবান।

হে আল্লাহ্! তুমি বরকত বা রহমত নাযিল কর মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি যেমন তুমি বরকত বা রহমত নাযিল করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংসিত এবং মহামর্যাদাবান।"

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর ছিলেন। তিনি সর্বদা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি সর্বদা বলতেন যে "আমি যা লাভ করেছি, তা শুধু হযরত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ফলে; আর তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমেই লাভ করেছি।" তিনি সর্বদা সকলকে হযরত রাসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের নসিহত করতেন। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল।

"হে লোক সকল! তোমরা ঐ রসূল (সা.)-এর উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ কর, যাঁর পদতলে সকল মানুষকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তিনি রহীম, করীম মহান আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষিত হয়েছেন। তিনি এক বিরাট জনসমাজকে ভয়ঙ্কর ও কঠিন জংগল হতে বের করে শান্তি ও নিরাপদ সবুজ বাগানে পৌঁছে দিয়েছেন .... এবং তিনি অসংখ্য মানুষকে কুফরী, গোমরাহি এবং সীমালংঘন থেকে বাঁচিয়েছেন। (রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, পৃ: ৪)

তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ "ইজাযুল মসীহ্" গ্রন্থে লিখছেন–

তোমরা ঐ করুণাময় নবী (সা.)-এর উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ কর, যিনি পরম দয়াময়, অযাচিত ভাবে দানকারী খোদা তা'লার গুণাবলীর বিকাশস্থল (মায্‌হার), এই কারণে মহানুভবতার প্রতি-উত্তরে মাহানুভবতা হওয়াই উচিত। যার অন্তরে মানব হিতৈষী রসূলে আকরাম (সা.)-এর এহসান বা অনুগ্রহের অনুভূতি নেই বা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, তার ঈমান নেই এবং সে তার ঈমানকে নষ্ট করতে প্রস্তুত। হে আল্লাহ্! এই মহান উম্মী নবী (সা.)-এর প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর, যিনি প্রথম-যুগের মানুষকে যেমন (অমৃত সূধা) পান করিয়েছিলেন, তেমনই শেষ-যুগের মানুষকেও পান করিয়েছেন। এবং তাদেরকে নিজ রংএ রঙ্গিন করেছেন এবং পবিত্র করেছেন....." (রূহানী খাযায়েন, ১৮ খন্ড, পৃ: ৫-৫)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে শত শত পৃষ্ঠা লিখেছেন। যেমন তিনি "সিরাজুম মুনীর" গ্রন্থে লিখছেন :

"আমরা যখন ন্যায়বিচারের দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তখন নবীদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয়নবী বলতে শুধু মাত্র একজন মহাপুরুষকে দেখি। অর্থাৎ নবীগণের প্রধান, রাসূলদের গৌরব, প্রেরিতদের মুকুট, যাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মুজতাবা

(সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম), যাঁর অনুসরণ, দশ দিন অনুগমন করলে এমন নূর (আলো) লাভ করা যায়, যা ইতিপূর্বে হাজার বছর চেষ্টা করলেও সম্ভব ছিল না।

শেষ উপদেশ এই যে, সকল নূর আমরা নবী (সা.) হতে লাভ করেছি এবং যে কেউ তাঁর (সা.) অনুসরণ করবে, সেও লাভ করবে।" (রূহানী খাযায়েন, ১২ খন্ড, পৃ: ৮২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমন বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে বলেছেন, তেমনই বেশী বেশী এস্তেগফারও করতে বলেছেন।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়ার আবেদন পত্রের উত্তরে চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবকে লিখেন :

".... এশার নামাযের পর নিয়মিত অনেক বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস রাখবেন। যদি প্রত্যহ ৩০০ বার দরূদ পাঠের অভ্যাস করেন, তবে ভাল হয়। অনুরূপ ভাবে ফজরের নামাযের পরে ৩০০ বার এস্তেগফারের নিয়ম রাখবেন।" (মাকতুব, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ইং মাকতুবাত ৫ম খন্ড, পৃ: ৩০২)

অনুরূপ ভাবে আরো অনেক সাহাবী (রা.)-কে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এশা অথবা মাগরিবের নামাযের পরে দরূদ শরীফ এবং ফজরের পরে এস্তেগফারের জন্য বলেছেন। তাছাড়া দরূদ শরীফের অর্থ বুঝে আন্তরিকতার সাথে দরূদ পাঠের জন্য তিনি (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, একবার মীর হামেদ আলী সাহেবকে হুযূর লিখছেন :

আপনি দরূদ শরীফ পাঠে মনযোগী থাকুন। যেমন এক ব্যক্তি তার প্রিয়জনের জন্য প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ বা মঙ্গল কামনা করে, ঠিক তেমনি গভীর আন্তরিকতা, আগ্রহের সাথে, একাগ্রচিত্তে হযরত নবী করীম (সা.)-এর জন্য কল্যাণ ও রহমত কামনা করবেন। আন্তরিক ব্যাকুলতার সাথে অকৃত্রিম দোয়া হওয়া উচিত। মূলত: মহানবী (সা.)-এর সাথে গভীর এবং প্রকৃত অর্থে আন্তরিক প্রেম ও ভালবাসা থাকা উচিত। অন্তরের অন্ত:স্থল হতে তাঁর জন্য ঐ সমস্ত কল্যাণ কামনা করা উচিত, যা দরূদ শরীফে বর্ণিত আছে।" (মাকতুবাত : ১২ই জুন, ১৮৮৩ইং মাকতুবাত প্রথম খন্ড, ২৪ পৃ:)

অতএব, দরূদ শরীফের অর্থ খুব ভাল করে বুঝে একাগ্রচিত্তে পাঠ করা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমাদের জন্য দরূদ শরীফ ও এস্তেগফার পড়া খুব বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কারণ বর্তমান মুসলিম জাহানের অবস্থার কথা মনে পড়লে কোন মুসলমানের অন্তরে ব্যাথা না জেগে পারে না। এমতাবস্থায় আমাদের সকলেরই বেশী বেশী দরূদ ও এস্তেগফার পাঠ করা উচিত। আহমদী ভাইদের কাছে আমরা আশা করি যে, তারা নিজেরাও যথারীতি এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন এবং সকলে নিজ নিজ পরিচিত অ-আহমদী ভাইদেরও অনুরোধ করবেন যে, তারাও যেন অনুরূপ আমল করেন। আমরা সকল আহমদীরা যদি অ-আহমদী ভাইদেরকে আজ দরূদ শরীফ ও এস্তেগফারের দিকে আহ্বান করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের দেশ ও জাতি তথা মুসলিম-বিশ্বের বড় উপকার হবে।

"ভেজ দরূদ উস্ মোহ্সেন পর তু দিল মে শ শ বার

পাক মুহাম্মদ মোস্তফা নবীওঁকা সরদার।"

অর্থাৎ "প্রতিদিন তুমি মহানবী (সা.)-এর প্রতি শত শত বার দরূদ পাঠ কর।

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) নবীদের প্রধান নেতা।"

আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি (হে মুহাম্মদ) তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তাদের আযাব দিবেন যখন তারা এস্তেগফার করতে থাকে।

আজ আমাদের মাঝে হুযূর নবীয়ে করীম (সা.) উপস্থিত নেই। কিন্তু দরূদ পাঠ করা এমন কর্ম যার ফলে রাসূল (সা.)-এর অনুপস্থিতি আমাদের জন্য কোন অকল্যাণের কারণ হবে না। হুযূর (সা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেভাবে হুযূর (সা.)-এর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সকল প্রকার কল্যাণ লাভ করেছিলেন, আজও দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে অনুরূপ কল্যাণ আমরা লাভ করতে পারি।

তওবা ও এস্তেগফার

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

অর্থাৎ এবং যে কেহ মন্দ কর্ম করে অথবা নিজের ওপর যুলুম (অত্যাচার) করে, অত:পর আল্লাহ্‌র নিকট এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করে) করে, সে আল্লাহ্‌কে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে।" (সূরা নিসা : ১১১)।

এই আয়াত উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন :–

"এই সুন্দর হেকমতপূর্ণ আয়াতের মর্ম এটাই যে, দুর্বল মানুষের স্বভাব এই যে, সে ভুল বা গুনাহ্ করে বসে, তেমনই অপর পক্ষে আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন স্বভাব এই যে, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তিনি স্বভাবত:ই বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। অর্থাৎ তাঁর ক্ষমাশীলতার গুণ সাময়িক বা আকস্মিক নয়, বরং চিরন্তন। তিনি যাকে ভালবাসেন, তার যোগ্যতাকে কল্যাণমন্ডিত করতে চান। অর্থাৎ যখন কোন মানব-সন্তান ভুল-ত্রুটি বা মন্দ কর্ম করবার পর অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করে, তখন সে আল্লাহ্‌র নিকট এই সুবিধা লাভ করে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমা-সুন্দর ও করুণার দৃষ্টি পাত করেন। অনুতপ্ত বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র এই করুণা-দৃষ্টি কারো জন্য সীমিত নয়, বরং এটা তাঁর মধ্যে চিরস্থায়ী সহজাত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন গুনাহগার বান্দা তাঁর নিকট তওবা করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর এই স্বাভাবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য ঐ বান্দার জন্য বিকশিত হতে থাকবে।" (রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, ১৮৭ পৃ: টীকা)

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আত্‌তায়্যেবু মিনায্ যাম্‌বে কামান্‌লা যাম্‌বালাহু" অর্থ : যে ব্যক্তি তওবা করে, সে আল্লাহ্‌র নিকট এমনই, যেন সে গুনাহ্ করেই নি।"
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তওবা ও এস্তেগফারের বিশ্লেষণ বিভিন্ন ভাবে করেছেন। যেমন :

"একটি গাছকে যেমন মাটি থেকে তুলে

ফেললে এটা পানি চুষতে না পেরে দিন দিন শুকিয়ে যেতে থাকে এবং এর সবুজ লাবন্য-অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়–মানুষের অবস্থাও ঠিক তেমনি। যার অন্তর বা আত্মা আল্লাহ্‌র ভালবাসা হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, তার ওপর ঐ গাছের শুষ্কতার ন্যায় গুনাহ্ বা পাপের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। মানুষের আত্মার এই শুষ্কতার প্রতিকার বা চিকিৎসা আল্লাহ্‌র বিধান মতে তিন প্রকারে করা সম্ভব :– (ক) আল্লাহ্‌র ভালবাসা (খ) এস্তেগফার, এর অর্থ গোপন বা আচ্ছাদনের চেষ্টা করা। কারণ গাছের শিকড় যতক্ষণ মাটিতে পোতা থাকবে, ততক্ষণ এর সবুজ থাকিবার সম্ভবনা থাকবে। (গ) তৃতীয়তঃ তওবা। তওবা অর্থ এই যে জীবন ধারণের জন্য পানি চুষণের/শোষণের নিমিত্তে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ করা এবং আমলে সালেহ (সৎকর্ম) দ্বারা 'অবাধ্যতা' বা নাফরমানী হতে নিজেকে বিরত রাখা। তওবা শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না, বরং স্বত:সিদ্ধ আমলে সালেহ (সৎকর্ম) দ্বারা হয়ে থাকে। সকল প্রকার পুণ্যকর্ম মূলত: তওবাকে পূর্ণতা দানের জন্যই সম্পাদন করা হয়। আর সবকিছুর মুখ্য উদ্দেশ্য, নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকটে নিয়ে যাওয়া। দোয়াও আসলে তওবা, কেননা আমরা তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করি।" (রূহানী খাযায়েন, ১২শ খন্ড, ৩২৯ পৃ:)

আজ আমাদের সকলের জন্য তওবা এবং এস্তেগফার খুব বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কারণ আজ আমাদের মানব সমাজ, বিশেষ করে মুসলিম-বিশ্ব এক ভয়ঙ্কর আযাবের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেছেন যে, আযাব হতে বাঁচবার সর্বোত্তম ও নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে বেশী বেশী এস্তেগফার করা। যেমন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۳۴﴾

"আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি (হে মুহাম্মদ!) তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় যিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে (এস্তেগফার করে) তখন তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। (সূরা আনফাল : ৩৪)।

এই আয়াত হতে পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপস্থিতিতে আযাব আসবে না। (ইতিহাসও এই সত্যকে প্রমাণ করেছে) অতএব, আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারীগণ (যদি এস্তেগফার করতে থাকেন) তা হলে নিশ্চয়ই নিরাপদ থাকবেন। কারণ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এরই খলীফা বা প্রতিনিধি এবং 'ফানা ফির রাসূল' বা রাসূল প্রেমে মগ্ন।

তওবা ও এস্তেগফারের দ্বারা যে শুধু আযাব হতেই নিরাপদ হওয়া যায়, তা নয়, বরং এস্তেগফারের ফলে, মানব সমাজে শান্তি ও কল্যাণ সাধিত হতে পারে এবং মানব সমাজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেছেন :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۱﴾ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿۱۲﴾ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿۱۳﴾

অর্থাৎ এবং আমি তাদেরকে বলেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (এস্তেগফার) কর, নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল : তিনি তোমাদের ওপর মুষল ধারে বর্ষণশীল মেঘ পাঠাবেন, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করবেন। (সূরা নূহ : ১১-১৩)

এই আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র সমীপে এস্তেগফার করতে থাকলে তিনি সময় মত বৃষ্টি দিবেন। ধন-সম্পদ ও জনসংখ্যার মাধ্যমে সাহায্য করবেন। খাদ্য-শস্য যথেষ্ট উৎপাদিত হবে। ধর্মপ্রাণদের জন্য এটা বুঝা মোটেই কষ্টকর হবে না যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় সৎকর্মশীল বান্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কখনই অভিশাপের কারণ হতে পারে না।

যখন এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট শক্তি কামনা করে অর্থাৎ এস্তেগফার করে, তখন রূহুল কুদুসের সাহায্যে তার দুর্বলতা দূরীভূত হতে পারে এবং সে পাপ কর্ম হতে বিরত থাকতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন : "যখন এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট শক্তি কামনা করে অর্থাৎ এস্তেগফার করে, তখন রূহুল কুদুসের সাহায্যে তার দুর্বলতা দূরীভূত হতে পারে এবং সে পাপ কর্ম হতে বিরত থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণ বিরত থাকেন। যদি এমন ব্যক্তি এস্তেগফার করে যে ইতিপূর্বে পাপে লিপ্ত ছিল, তবে এস্তেগফারের ফলে তাকে পাপের শাস্তি হতে বাঁচানো হতে পারে। কেননা আলোর আগমনে অন্ধকার থাকতে পারে না।" (রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড)

ইহকাল বা পরকালের সকল প্রকার আযাব হতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন বা ধাবমান হওয়া। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

তাক্‌ওয়াহ্ (আল্লাহ্‌কে ঢাল হিসাবে গ্রহণ করা) অবলম্বন কর, কারণ তাক্‌ওয়া অবলম্বনের পরেই আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ সমূহ এসে থাকে। মুত্তাকীকে জগতের সকল বালামুসিবত (বিপদ-আপদ) হতে বাঁচানো হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাদের জন্য আবরণ ও আচ্ছাদন হয়ে যান।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪২ পৃ:)

নিয়মিত এস্তেগফার ও দরূদ পাঠের মাধ্যমে আমরা মুত্তাকী হতে পারি। এছাড়া মুত্তাকী হওয়া যায় না। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় হোন।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-২)

১। জিহাদ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা ঃ

জিহাদ সম্পর্কে প্রধানতঃ দুই প্রকার ধারণা রয়েছে। ***প্রথমত:*** সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী তথাকথিত কিছু মুসলিম নামধারী আলেম এবং সেই সঙ্গে ইসলামের শত্রগণের মতে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর যুদ্ধ সমূহ আক্রমনাত্মক ছিল এবং ইসলাম তরবারির শক্তি দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। ***দ্বিতীয়ত:*** নিরপেক্ষ গবেষণা দ্বারা নির্নীত হয় যে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করেন নাই এবং তাঁর সকল যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক। যেভাবে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (সুরা হাজ্জঃ ৪০-৪১)। বস্তুত:পক্ষে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে শুধু মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক চরিত্রের আকর্ষণ–মূলক শক্তির দ্বারা। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে। ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত উপরোক্ত দুটি মতের প্রথমটি অর্থাৎ ভ্রান্ত ধারনা সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

(ক) মৌলানা মৌদুদী প্রণীত "আল-জিহাদ ফিল ইসলাম" নামক পুস্তকের উদ্ধিতি নিম্নরূপঃ

"মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত আরবকে ইসলামের আহ্বান জানাতে থাকেন এবং মানুষকে বুঝাবার জন্য যত প্রকার উৎকৃষ্ট পন্থা আছে তাহা অবলম্বন করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার তরফ হইতে বিস্ময়কর মোজেযা প্রদর্শন করেন। তিনি সদাচার ও স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা পূণ্যের সেরা আদর্শও পেশ করেন। তিনি সত্য প্রকাশ ও সংস্থাপনের জন্য উপযোগী কোন উপায় বাদ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার সত্যতা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্বজাতি তাঁহার আহবানে সাড়া দেয় নাই। কিন্তু ওয়াজ-নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহবায়ক যখন তরবারি হাতে লইলেন... তখন মানুষের মন হইতে ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুস্কৃতির কালিমা দূর হইতে লাগিল। তাহাদের প্রকৃতি হইতে আপনাআপনি ক্লেদ দূর হইয়া গেল। মনের গ্লানি পরিষ্কার হইয়া কেবল চক্ষুই আবরণমুক্ত হইয়া সত্যের আলো দৃশ্যমান হইল না, পরন্তু তাহাদিগের ঘাড়ে সেই কঠোরতা এবং তাহাদিগের মস্তিষ্কে সেই অহঙ্কারও রহিল না, যাহা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষকে উহার সম্মুখে নতি স্বীকারে বিরত রাখে। আরবের ন্যায় অন্য দেশগুলিও এত তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করিল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ পৃথিবী মুসলমান হইয়া পড়িল। ইহার একই কারণ ছিল যে, ইসলামের তরবারি হৃদয়ের উপরিস্থিত সকল আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল।" [আল-জেহাদ ফিল ইসলাম, ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা]

(খ) 'হকিকাতে জিহাদ' নামক পুস্তকে মৌলনা মৌদুদী লিখেছেন যে যুদ্ধ করে অমুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে এবং সেখানে ইসলামী শক্তি কায়েম করতে হবে ! "কোন একটি দেশও উহার নীতি সম্পূর্ণ পালন করিতে পারে না, যে পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশে ঐ নীতির প্রচলণ না হয়। সুতরাং মুসলিম পার্টির পক্ষে সাধারণ সংস্কার এবং আত্মরক্ষা উভয় উদ্দেশ্যেই ইহা ছাড়া উপায় নাই যে, কোন একটি মাত্র দেশে ইসলামী নেজাম স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া বরং এই নেজামকে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করে। তাহার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্বে প্রচার করিবে এবং সকল দেশের অধিবাসীকেই এই নীতি গ্রহণের জন্য আহবান করিবে এবং এই নীতি গ্রহণেই তাহাদের মঙ্গল। পক্ষান্তরে, তাহাদের শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া অমুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিবে এবং তথায় ইসলামী হুকুম কায়েম করিবে।"

তিনি আরো লিখেছেনঃ "এই পলিসীই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছিল। তাঁহার পর খোলাফায়ে-রাশেদীন ইহাই পালন করেন। আরব, যেখানে প্রথম মুসলিম পার্টি জন্ম গ্রহণ করে , সেই দেশকেই সর্বপ্রথম ইসলামী হুকুমের অধীন করা হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাশ্ববর্তী দেশগুলিকে তাঁহার নীতির দিকে আহবান করেন। কিন্তু এই আহবানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, শক্তি সঞ্চয় করা মাত্র তিনি রোমক সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। আঁ-হযরত (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) পার্টির নেতা হইলেন, তিনি রোম ও ইরাণ উভয় গয়ের–ইসলামী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন এবং হযরত উমর (রা.) এই অভিযানকে বিজয়ের শেষ সীমানায় পৌছান।"(হকিকাতে জিহাদ)।

(গ) মৌলানা মৌদুদী আরো লিখেছেন যে আইন প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা কড়িয়া নিতে হবে: "যে দেশেই তোমাদের শাসন কতৃত্ব লাভ হয়, সেখানে খোদার সৃষ্টির ইসলাহের জন্য দাঁড়াও। রাষ্ট্রের ভ্রান্ত নীতিকে শুদ্ধনীতি দ্বারা বদলাইবার চেষ্টা কর। যাহারা খোদাকে ভয় করে না এবং বলগাহীন উষ্ট্রের ন্যায় তাহাদিগের নিকট হইতে আইন প্রনয়ণ ও শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লও।"(হাকিকতে জিহাদ)।

তিনি একই পুস্তকে স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, যুদ্ধ করে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিলোপ সাধন করতে হবে: " একদিকে এই মুসলিম পার্টী দেশের অধিবাসীদেরকে এই নীতি মানিয়া লইতে আহবান করিবে যাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত। অপরদিকে ঐ মুসলীম পার্টির শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া অ-ইসলামী রাষ্ট্রগুলির বিলোপ সাধন করিবে।" (হাকিকতে জিহাদ)।

(ঘ) ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বিজাতীয় তথা অমুসলিম কিছু লেখক এবং চিন্তাবিদ উপরিল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোর মতই শত্রুতামূলকভাবে ইসলামের শান্তিবাদী নীতির ওপর কটাক্ষ করেছেন এবং অস্ত্রের দ্বারা ইসলাম প্রচারের অপবাদ আরো উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

ইসলামবিরোধীদের মধ্যে ডেজি, স্মিথ, জর্জ সেল, প্রভৃতি লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য।

ডেজি বলেনঃ ' মোহাম্মদ (সা.) এর সেনাপতি এক হাতে তলোওয়ার এবং অন্য হাতে কুরআন লইয়া শিক্ষা দান করিতেন।"

স্মিথ বলেন যে, সেনাপতিদের কথা দূরে যাউক,"তিনি স্বয়ং এক হাতে তলোওয়ার এবং অন্য হাতে কুরআন লইয়া বিভিন্ন জাতির নিকট উপস্থিত হইতেন।"

জর্জ সেল এই মীমাংসা দিয়েছেনঃ "তাঁহার দল-বৃদ্ধি হওয়ার পর তিনি দাবী করেন যে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এবং তরবারির বলে পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন করিয়া সত্য ধর্ম স্থাপনের অনুমতি তিনি আল্লাহ্ তা'লা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

পাদ্রী-ফান্ডার লিখেছেনঃ

"এ যাবৎ হযরত মোহাম্মদ (সা.) ১৩ বৎসর ধরিয়া নম্র ও অনুগ্রহপূর্ণ পন্থায় তাঁহার ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ---- এজন্য এখন হইতে আঁ-হযরত আন্-নাবী-বিস্-সাইফ বলিয়া অভিহিত হইলেন অর্থাৎ, অসি চালক নবী হইয়া পড়িলেন। এখন হইতে ইসলামের সব চাইতে মজবুত ও কার্যকরী দলীল তলোয়ার।" (মিযানুল হক, ৪৬৮ পৃঃ)

"আমরা হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁহার অনুবর্তিদের নীতি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে, এখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন 'ওকবায়' প্রকাশিত প্রশংসনীয় নৈতিকতা পালনের প্রয়োজন নাই। এখন খোদা তাঁহার নিকট শুধু এই একটি বিষয়ই চাহিতেন যে, আল্লাহর পথে যেন তিনি যুদ্ধ করেন এবং তরবারি, তীর–ধনুক ও খঞ্জর দ্বারা হত্যার পর হত্যা করিয়া যান।" (মিযানুল হক, ৪৬৮ পৃঃ)

মিঃ হেনরী কুপারের এই কথাগুলি পড়ুনঃ "তাঁহার (মহানবী সা.–এর) নবুওতের ত্রয়োদশ সনে তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে, খোদা তাঁহাকে শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধেরই অনুমতি দেন নাই, বরং তাঁহার ধর্ম তরবারির বলে বিস্তার করিবারও অনুমতি দিয়াছেন।"(আরব জাতির ইতিহাস , ১ম খন্ড)।

ডাঃ স্প্রেঙ্গর লিখেছেনঃ "এখন পয়গম্বর (সা.) বিপ্লব থামাইবার জন্য তাঁহার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার আইন খোদার নামে প্রকাশ করিলেন এবং এখন হইতে (নাউযুবিল্লাহ-লেখক) তাঁহার খুনি-ধর্মের নীতি হইল যুদ্ধংদেহি শ্লোগান।" (মুকদ্দমা তাহকিকুল জেহাদ', তারিখে মুহাম্মদীর বরাতে, ২০৭পৃঃ) । [১]

জিহাদ সম্পর্কিত উপরোক্ত ভ্রান্ত-ধারণগুলোর মূল কারণ হলো এই যে, 'প্রকৃত জিহাদ' এবং 'জিহাদের নামে রক্তপাতের ঘটনাবলী' এক কথা নয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী মুসলিম-নামধারী নেতৃবর্গ এবং তাদের অন্ধ-অনুসারীগণ ইসলামের নামে জনগণকে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।

তৃতীয় কারণ হলো এই যে, বিজাতীয় শত্রুগণ যথাযথভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি এবং জিহাদ বলতে কি বুঝায় তা সঠিকভাবে অবগত না হওয়ার জন্য তারা এই মর্ম্মে অপবাদ দিয়েছে এবং এখনও দিয়ে চলেছে যে, ইসলাম এক হাতে তলোয়ার এবং অন্য হাতে কুরআনের বাণী অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারাই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে।

চতুর্থত: সাম্প্রতিক কালের জঙ্গীবাদী বিভিন্ন লোম-হর্ষক ঘটনাবলী, মুসলিম দেশ সমূহের আভ্যন্তরীণ সংঘাত–মূলক কর্মকান্ড এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জিহাদ সম্পর্কিত বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ধ্যান-ধারনার দ্বারা পৃথিবীব্যাপী আত্মঘাতী কর্মকান্ড এবং খুন-খারাপী আরো বেশী জটিল সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে ইসলাম–বিদ্বেষীদের অপপ্রচার এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কটুক্তি এবং কুরুচীপূর্ণ 'ফিল্ম' তৈরির প্রয়াশ, পবিত্র কুরআনে অগ্নি সংযোগের মত ন্যাক্কারজনক ঘটনাবলী খুবই দুঃখজনক।

এই সকল বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সর্ব প্রথমে ইসলাম এবং ইসলামে জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করা অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা দানের জন্য যুক্তি-জ্ঞান, ঐশী-নিদর্শন এবং ঐশী-সাহায্য দ্বারা দাঁত–ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে লেখনীর দ্বারা এবং পৃথিবীব্যাপী সেই জবাবগুলোকে সু-সংগঠিত ভাবে প্রচারের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এইরূপ চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের নামই প্রকৃত জিহাদ। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ এবং সাহায্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পৃথিবীব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং সুসংগঠিত পরিকল্পনার মাধ্যমে 'অসি নয় মসি' দ্বারা বিগত শতাধিক বছর যাবত ইসলামের প্রকৃত জিহাদ করে চলেছে।

নীতিগতভাবে পবিত্র কুরআনে ধর্মীয়-স্বাধীনতার সার্বজনীন স্বীকৃতি (সূরা বাকারা:২৫৭) এমন একটি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা,

যা অস্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সকল প্রকার ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সমগ্র জীবন–ব্যাপী এই নীতি ও আদর্শ থেকে এক বিন্দু পরিমানও বিচ্যুত হননি। নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্বপ্রমাণিত। তিনি অস্ত্র ব্যবহার করতে তখনই বাধ্য হয়েছিলেন, যখন আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। যখন তিনি মক্কা থেকে চরম অত্যাচার ভোগের পর মদীনায় হিজরত কালীন অবস্থায় শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, তখন আত্ম–রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন (সূরা হাজ্জ: ৪০-৪১)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (সা.) বলেছেনঃ "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়াহে ওয়াসাম মক্কা মুয়াযযামায় এবং তারপরও কাফেরদের হাতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। বিশেষতঃ মক্কার তের বছর এই মহাবিপদ ও প্রত্যেক প্রকারের যুলুম-নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, যা কল্পনা করতেও কান্না আসে। কিন্তু তিনি তখনও শত্রুদের মোকাবেলায় তলোয়ার ধারণ করেননি, এবং তাদের কঠোর গালমন্দের উত্তরও দেননি। অতএব প্রমানিত, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর সাহাবাগণ (রা.) ধর্ম বিস্তারের জন্যে কখনও যুদ্ধ করেছিলেন অথবা কাউকে জবরদস্তি ইসলাম ধর্মে প্রবিষ্ট করেছিলেন, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল এবং অন্যায়" (মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ–পৃঃ ৭,৮)।

২। ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী 'জিহাদ'- এর প্রকৃত অর্থ

'জিহাদ' একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। দীনের আলেম ও ফকীহ্‌গণ জিহাদের বহুবিধ শ্রেণীভেদ স্বীকার করেছেন। যেমন, জিহাদ বিন্নফ্‌স (আত্মশুদ্ধিমূলক জিহাদ), জিহাদ বিল-মাল (অর্থ দ্বারা জিহাদ), জিহাদ বিল-ইল্‌ম (জ্ঞান দ্বারা জিহাদ), জিহাদে আকবার (সর্ববৃহৎ জিহাদ), জিহাদে কবীর (বৃহৎ জিহাদ) এবং জিহাদে আসগার (ক্ষুদ্র জিহাদ)।

জিহাদে-আসগার অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারা যে ক্ষুদ্র জিহাদ করা হয়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার পূর্ববর্তী উলামা ও ফুকাহা জিহাদের এই শ্রেণীকে, যা কুরআনের পরিভাষায় 'কিতাল'–বিশেষ অবস্থা এবং শর্তাবলীর সাথে সংযুক্ত বলে নির্ধারণ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কালক্রমে জিহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ঢুকে পড়েছে যে, ইসলামকে যুদ্ধের মাধ্যমে তলোয়ারের জোরে বিস্তার দেয়ার নাম জিহাদ।

(ক) জিহাদে আকবর বা সর্বোত্তম জিহাদ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জিহাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, বৃহত্তম জিহাদ বা জিহাদে আকবর দ্বারা আত্ম-সংশোধন মূলক সার্বক্ষনিক চেষ্টা–প্রচেষ্টার মাধ্যমে শয়তানী প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপন কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে বুঝায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেনঃ

"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ করো । তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি তোমাদের ওপর ধর্ম সম্পর্কে কোন কঠোরতা চাপাইয়া দেন নাই" (সূরা হাজ্জ:৭৯)। অনুরূপভাবে অন্য সুরায় বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি চেষ্টা সাধনা করে, বস্তুত: সে নিজেরই প্রাণের জন্য চেষ্টা সাধনা করে। আল্লাহ জগত সমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন" (সূরা আনকাবুত:৭)। এই আয়াত জিহাদকারী তথা মুজাহিদ অর্থাৎ আল্লাহর পথে কঠোরভাবে সংগ্রামকারীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই সংগত বর্ণনা দিয়েছে। দৃঢ় এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে উচ্চ ও মহান আদর্শের প্রকৃত অনুশীলন করার নামই ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ এবং যে ব্যক্তি এগুলি জীবনে পালন করে চলে, সত্যিকার অর্থে তিনিই একজন 'মুজাহিদ'।

(খ) 'জিহাদে কবীর' বা বৃহত্তর জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি এর (কুরআনের) সাহায্যে তাদের (কাফেরদের) সাথে বৃহত্তর জিহাদ করো" (ফুরকান:৫৩)। এই আয়াত অনুযায়ী প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হচ্ছে কুরআনের বানী প্রচার করা। অতএব ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টার নামই প্রকৃত জিহাদ যা সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক মুসলমানকে। এই জিহাদের কথাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক যুদ্ধের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেছিলেনঃ "আমরা ক্ষুদ্রতম জিহাদ (জিহাদে আসগর) হতে বৃহত্তর জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি ।" (রাদ্দুল মুহাতার)।

পবিত্র কুরআনে প্রচার-পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী রয়েছে, যার মধ্যে শক্তি বা অস্ত্র প্রয়োগের কথা বলা হয় নাই। যেমন সুরা নহল: ১২৬ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন: "তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা-জ্ঞান-বিজ্ঞান) দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করো এবং তাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক করো, যা সর্বাধিক উত্তম।" মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে যে সকল বর্ননা রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কথা কখনই বলা হয় নাই। যেমন সূরা বাকারা: ১৩০ এবং সূরা জুমুয়া: ৩ আয়াতে চারটি প্রধান কার্যাবলীর কথা বলা হয়েছে :

১–আল্লাহ্‌র আয়াত সমুহ আবৃতি করা।

২–আনুসারীদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করা।

৩–অনুসারীদেরকে কিতাব তথা কুরআনের শিক্ষা দান করা এবং

৪–হিকমত বা অন্তর্নিহিত জ্ঞান শিক্ষা দান করা। উল্লেখ্য যে, এই সকল কাজের মধ্যে শক্তি প্রয়োগের কোন কথা নেই।

জিহাদ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীসের বর্ণনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, ইসলামের শিক্ষার অনুশীলন এবং প্রচারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টার নামই হলো প্রকৃত জিহাদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপঃ

"মুশরিকদের সাথে ধন-প্রাণ ও কথা দ্বারা জিহাদ করো" (আবু দাউদ)। ''অত্যাচারী ও যালেম শাসকের সম্মুখে হক কথা বলাই হলো উত্তম জিহাদ" (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)। "সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মৃজাহিদ, যে তার নাফসের সহিত জিহাদ করেছে" (আবু দাউদ)।

"আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হক

ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জিহাদে লিপ্ত থাকবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দল দাজ্জালের সঙ্গে মোকাবেলা করবে" (আবু দাউদ)। "যে ব্যক্তি, সুরা কাহাফের প্রথম দিকের দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদ রাখা হবে" (মুসলিম)।

উল্লেখ্য যে, সুরা কাহাফে প্রথম দশ আয়াতে বিশেষভাবে ত্রিত্ববাদীতার কথা বলা হয়েছে। দাজ্জালের মোকাবেলা বলতে অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা দাজ্জাল বধ করাকে বুঝায় না। যুক্তি–প্রমাণ, ঐশী-নিদর্শন এবং ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে দাজ্জালী ফিতনা সৃষ্টিকারী খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের মুলোৎপাটন করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে আখেরী যুগে আগমনকারী ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ওপর। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে বর্তমান যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পৃথিবীব্যাপী দাজ্জালের ত্রিত্ববাদী ফিতনার মুলোৎপাটন করেছে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি–প্রমানের মাধ্যমে। পৃথিবীব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে সকল ধর্মের ওপর ইসলামের চুড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য পৃথিবীব্যাপী সত্যিকার অর্থে জিহাদে আকবর এবং জিহাদে কবীরের দায়িত্ব পালন করে চলেছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। এই কারণে হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী 'ইয়াজাউল হারব' (মসীহ মাওউদ কর্তৃক যুদ্ধ রহিতকরণ) পূর্ণতা লাভ করবে, অন্য কোন পথ ও পন্থা তথা অস্ত্র-প্রয়োগের মাধ্যমে নয়।

"তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরীয়মকে ন্যায়-বিচারক ইমাম মাহদী রূপে। তিনি ক্রুশ (মতবাদ) ধ্বংশ করবেন এবং শুকর (বদযবান ও নির্লজ্জ ব্যক্তিদেরকে আধ্যাত্মিক অর্থে) নিধন করবেন এবং ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করবেন" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। এই হাদীসে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন এবং তাঁর প্রধান প্রধান কার্যাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এই সকল কার্যাবলীর মধ্যে যুদ্ধ-রহিত-করণ সম্পর্কিত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর দ্বারাও প্রমাণীত হয় যে, ধর্মের উদ্দেশ্যে অস্ত্রের যুদ্ধ রহিত হবে।

"প্রতিশ্রুত মসীহের নিঃশ্বাস যে কাফেরের ওপর নিপতিত হবে, সেই মরে যাবে এবং তাঁর নিঃশ্বাস তাঁর দৃষ্টির শেষ-সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করে 'বাবেলুদ' নামক স্থানে তাকে ধরবেন এবং কতল করবেন" (মিশকাত/মুসলিম)। উল্লেখ্য যে, প্রতিশ্রুত মসীহের শক্তিশালী নিঃশ্বাসে কাফেরের মৃত্যু হওয়া এবং 'দাজ্জাল কতল করা' কথাগুলো রূপকভাবে প্রযোজ্য। অন্যথায় কথাগুলো পরস্পর-বিরোধী (নিঃশ্বাসে মরণ হলে যুদ্ধের দ্বারা দাজ্জাল কতলের প্রশ্ন অযৌক্তিক)। উক্ত বিষয়গুলোর রূপকার্থে তাৎপর্য হলো যুক্তি-জ্ঞান এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা ইসলামের সত্যতা এবং কাফেরদের ভ্রান্ত-ধারণাসমূহ (বিশেষত: খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের) গোলক-ধাঁধাঁ দূরীভূত হবে।

হযরত রাসূল করীম মুহাম্মদ (সা.) বলেছেনঃ "যাঁর আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, অচিরেই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাজেল হবেন– ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারী রূপে। তৎপর তিনি শূকর হত্যা করবেন, যুদ্ধ রহিত করবেন (অথবা বলেছেন: জিজিয়া উঠাইয়া দিবেন), এমনভাবে মাল দান করবেন, যা কেউই গ্রহণ করতে পারবে না" (বুখারী ও অন্যান্য হাদীস)। এই হাদীসেও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কে যুদ্ধ রহিত করনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ফলত: যুদ্ধবাজ হযরত মসীহ (আ.)-এর আগমনের অপেক্ষা করা নিরর্থকই বটে।

"ইয়াজুজ-মাজুজের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে" (মুসলিম ও তিরামিযী)। এই হাদীসে আখেরী যুগে ইয়াজুজ–মাজুজ-রূপী পাশ্চাত্য জাতি সমর শক্তিতে এতবেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, অপর জাতিগুলো মিলিতভাবেও তাদের মোকাবেলা করতে সক্ষমতা রাখে না। তারা আপসের মাধ্যমে যুদ্ধ ও মহা-যুদ্ধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, পরাশক্তিগুলোর সংগে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁর দল আখেরী যুগে বাহ্যিকভাবে যুদ্ধ বা মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না। ফলত: যারা ঐশী-সাহায্য এবং যুক্তি–জ্ঞানের পরিবর্তে বর্শা-বল্লম এবং তলোয়ারের যুদ্ধের কথা ভাবছেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

(গ) জিহাদে আসগর (ক্ষুদ্র জিহাদ) ঃ

জিহাদে আসগর দ্বারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করাকে বুঝায়, যা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ২২:৪০-৪১, ২:১৯১-১৯৪, ৪:৭৬, ৪:৯৬-৯৭, ৮:১৯, ৬১ এবং ৪৬ দ্বারা নীতিগতভাবে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াতের বরাত নিম্নরূপ:

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে) যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো। কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে এই কারণে বহিস্কার করা হয়েছে যে তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ যদি এই সকল মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করেন, তাহলে সাধু-সন্নাসীগনের মঠ, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এরং মসজিদ-সমুহ, যাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, সেগুলোকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হতো" (সুরা হাজ্জ:৪০-৪১)।

"এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকেই সাহায্য করেন, যারা ধর্মের পথে সাহায্য করে। নিশ্চই আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান, মহা-পরাক্রমশীল" (সূরা বাকারা : ১৯১)। "এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ কর, (কাতেলু ফি সাবিলিল্লাহ) যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আনফাল : ৪০)। "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না নির্যাতন বন্ধ হয় এবং ধর্ম পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়। কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তাহলে তারা যা কিছু করে, নিশ্চয় তা আল্লাহ্ সম্যকভাবে অবগত"(সুরা মায়েদা : ৫২)। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি এবং খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অন্যের বন্ধু"(সুরা তাওবা)।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের তাৎপর্য ইহা নয় যে, ইহুদি–খৃষ্টানদের প্রতি তথা অন্য ধর্মাবলম্বিদের প্রতি ন্যায়–নীতি পূর্ণ এবং কল্যাণ–মুলক ব্যাবহার নিষিদ্ধ অথবা অনুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই আয়াতে ঐসব ইহুদী ও খৃষ্টানদের সংশ্রব ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, যারা ছিল

মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সূরা তওবার কতকগুলো আয়াত সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন অনেকেই। যে সকল পৌত্তলিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাদের সঙ্গে যতক্ষণ কোন সন্ধির প্রস্তাব করা হয় নাই– তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে (৫ ও ৬ আয়াতে)। এই সকল আয়াত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, অস্ত্রের বলে পৌত্তলিকদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে যুদ্ধ করা হয় নাই। যদি কোন পৌত্তলিক ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে বলা হয়েছে (৬ আয়াত)। সাধারণ মুসলিম নাগরিক যেমন বিধি-বিধান অনুযায়ী যাকাত দিতে বাধ্য, তেমনিভাবে ইসলামী-রাষ্ট্রের অধীনস্থ অ-মুসলিম নাগরিকগণ যাকাতের পরিবর্তে 'জিযিয়া' নামক কর দিতে বাধ্য এবং এই নীতির ব্যতিক্রম হলে তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (আয়াত ২৯) । উল্লেখ্য যে, এই নীতির আলোকে এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে 'রিদ্দার যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে বিদ্রোহীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই নীতি অবশ্যই সঠিক ছিল।

(ঘ) 'জিহাদে আসগর' সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম–কানুনঃ

সূরা বাকারা : ১৭৮, ১৯১-১৯৪, সূরা হাজ্জ : ৪০-৪১ সূরা আনকাল : ১৬-১৭, ৪০, ৫৮, ৬১, ৬২ এবং সূরা তাওবা : ৪-৬ এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্তের আলোকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করা হয়েছে :

১) আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরেই করা যেতে পারে। আত্মস্বার্থ, ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি, জাতীয়-স্বার্থের সম্প্রসারণ, ইত্যাদি কারণে যুদ্ধ করা যাবে না।

২) আক্রমনকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানরা যুদ্ধ করতে পারে। তারা নিজেরা প্রথম আক্রমনকারী হতে পারে না।

৩) যদিও শত্রুরা প্রথম আক্রমণ করে, তথাপি মুসলমানরা যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখতে আদিষ্ট হয়েছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪) মুসলমানরা শুধু শত্রু-পক্ষের যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে। কিন্তু তারা কোন বেসামরিক ব্যক্তিকে আক্রমণ কিংবা অপমান করতে পারবে না।

৫) যুদ্ধ–চলাকালীন সময়েও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না।

৬) ধর্মীয় তীর্থস্থান আক্রমন করা কিংবা ঐগুলোর কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ– এমনকি ঐ সকল স্থানের আশে-পাশে যুদ্ধ করাও নিষিদ্ধ।

৭) যদি শত্রুপক্ষ তাদের ধর্মীয়-স্থানে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ চালায়, কেবল মাত্র তখনই মুসলমানগণ সেখানে যুদ্ধ করতে পারবে।

৮) যুদ্ধ ততক্ষণই চালিয়ে যাবার অনুমতি রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয়-ব্যাপারে জবরদস্তী ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হবে।

৯) কার্যকর যুদ্ধ–প্রস্তুতি এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

১০) যুদ্ধকালীন সাহসীকতা এবং কর্তৃপক্ষের অনুবর্তিতার প্রতি অবিচল দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১) সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ। যদি শত্রপক্ষ শান্তির দিকে ঝুঁকে, তবে মুসলমানগণও শান্তি-প্রস্তাবের দিকে ঝুঁকবে। জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে।

মহানবী মুহাম্মদ (সা.) -এর জীবনাদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সকল নিয়মকানুন প্রমানিত। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় এরূপ জিহাদকে 'কেতাল' বলে নির্ধারিত করা হয়েছে, যার জন্য বিশেষ-অবস্থা এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দুভার্গ্য বশত: মুসলিম উম্মতের মধ্যে নানা কারণে কালক্রমে জিহাদে আসগরের ধারণাকে অপব্যাখ্যা করত: এই ভ্রান্ত-ধারণা অনুপ্রবেশ করেছে যে, ইসলাম যুদ্ধের মাধ্যমে তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে (এ ধরনের ভ্রান্ত-ধারনার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা আগেই উল্লেখ করেছি)।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথমযুগে মহানবী (সা.) যে সকল যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেগুলো ছিল একান্তভাবে আত্মরক্ষা-মূলক। সেই যুদ্ধগুলো কতকগুলো শর্ত-সাপেক্ষে ন্যায়-নীতি এবং পরমত-সহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিল। প্রকৃত ইসলাম কখনই আক্রমনাত্মক যুদ্ধ, ন্যায়–নীতি–বর্জিত হত্যাকান্ড এবং রক্তপাতের অথবা কোন প্রকার হীন-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদী কর্ম-কান্ডকে সমর্থন করে নাই। নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে ইসলামের ইতিহাসের বদরের যুদ্ধ, ওহোদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য যুদ্ধগুলো ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং ন্যায়নীতি–ভিত্তিক। এই বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপঃ

"আমরা এখন আঁ-হযরত সাল্লালাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের নবুওতের দাবীর সময় হইতে তাঁহার মৃত্যু-কাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলির ওপর সন্ধানী-দৃষ্টি চালাইয়া দেখি যে, কোনও সময়ে কোনও প্রকার বল প্রয়োগে মুসলমান করিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? দৃষ্টান্ত–স্থলে, যুদ্ধে বিজয় লাভের অব্যবহিত পরেই শত্রুদিগকে জোর করিয়া ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রণোদিত করা হইয়াছে কি-না, বা তাহাদের প্রাণ রক্ষা করা হইয়াছে কি-না বা স্বাধীনতার জন্য মুসলমান হওয়াকে শর্ত রাখা হইয়াছে কি-না? হযরত রাসূল আকরাম সাল্লালাহু আলাইহে ও সাল্লামের মক্কা বিজয় কাল পর্যন্ত জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত: নবুওতের দাবী হইতে হিজরত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ছিল চরম অত্যাচার ভোগের কাল। সাধারণতঃ ইহাকে মক্কায় অবস্থানকাল বলা হয়।

দ্বিতীয়ত: মদীনায় অবস্থানকাল। ইহা হিজরতের বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাচার ভোগের সময়। কারণ, যদিও এ সময় মুসলমানগনকে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু শত্রুদের তুলনায় সংখ্যা অথবা যুদ্ধ-উপকরণ, কোন দিক দিয়াই তাহাদের কোন মর্যাদা ছিল না। সমগ্র আরবের বুকে কেবল মদীনাই ছিল একটি জনপদ, যেখানে মুসলমানগণ একতাবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন এবং এই একটি মাত্র বসতিও তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত ছিল না। ইহার এক বৃহৎ অংশ তিনটি অত্যন্ত ধনাঢ্য ইহুদী-গোত্রের অধিকারভুক্ত ছিল।

আউস এবং খাযরাজ গোষ্ঠির সকল ব্যক্তি তখনও ইসলাম বরণ করে নাই। মুসলমানগণের তখনকার অবস্থার দৃষ্টান্ত যেন মহাশক্তিশালী পাহলোয়ানের মুকাবিলায় কোন দুর্বল-শিশুকে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সেই শক্তিশালী পাহলোয়ান দূর্ভেদ্য বর্মাবৃত। তাহার হাতে বর্শা। তলোয়ার কটিতে বাঁধা। সে এক বিরাট যুদ্ধের ঘোড়ায় সওয়ার। কিন্তু শিশুর পা নগ্ন। দেহ অর্ধ উলঙ্গ। সে এক ভাঙ্গা তরবারি নিয়া সেই পাহলোয়ানের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে। সমগ্র আরবের শক্তি মদীনাবাসী এই মুষ্টিমেয় মুসলমানের তুলনায় অত্যন্ত প্রবল ছিল। শুধু বদরের যুদ্ধেই আক্রমণকারী শত্রুদের ও মুসলমানগনের আত্মরক্ষাকারী বাহিনীর তুলনা করিলে, উহা এমনই প্রকার তুলনা হইবে। এই সময়কেও ভীষণ অত্যাচার ভোগের কালই বলিব, যতই কেন স্বীকার করা হউক না যে, আত্ম-রক্ষার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিস্তৃত সময়। ইহা শান্তি ও সন্ধির কাল। এই সময়ে মক্কার কুফফারের দিক হইতে মুসলমানগণের ওপর কোন আক্রমন চলে নাই। তথাপি ইহুদী ও অন্য কোন গোত্রের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য মুসলমানগনকে আত্মরক্ষামূলক সামরিক-তৎপরতায় বাধ্য হইয়া নামিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে হযরত রাসূল করীম (আ.) কে স্বয়ং পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং কোন কোনটিতে তিনি সাহাবাগণকে পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন।" [২]

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ এবং সেই সংগে ন্যায়–ভিত্তিক যুদ্ধ–নীতির অনুসরণ ব্যতীত ধর্ম প্রচারের জন্য অস্ত্র ধারনের অনুমতি ইসলাম কখনই প্রদান করে নাই। পক্ষান্তরে জিহাদে কবীর এবং জিহাদে আকবরে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে শান্তির ধর্ম ইসলাম। আহমদীয়া মুসলিমগণ বিশ্বব্যাপী সেই আধ্যাত্মিক জিহাদ পরিচালনার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষাই প্রচার করে যাচ্ছেন সুসংগঠিতভাবে ঐশী–প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। □

বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) বলেছেনঃ "কুরআন করীমে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না। দীনের সাক্ষাৎ-সৌন্দর্যরাজি, গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পেশ কর এবং পুণ্য নমুনা ও আদর্শপূর্ণ দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ কর" (সিতারা-এ-কায়সারিয়াঃ পৃঃ ১৬)। "আমি জানি না, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোথায় এবং কার কাছে শুনতে পেয়েছেন যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। খোদা তা'লা তো কুরআন করীমে বলেনঃ "লা ইকরাহা ফিদ্দিন" অর্থাৎ 'ইসলাম ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই' (পয়গামে সুলেহ)। (চলবে)

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

"মন প্রাণ দিয়ে নিজের স্বামীর অনুগতা হও। তার সম্মানের অনেকখানি তোমার আওতায় রয়েছে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

হযরত ইমাম মাহদী (আ)-এর জীবদ্দশায় প্রথম ও শেষ সালানা জলসা

মাওলানা জাফর আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ

১৮৯১ সালে প্রথম জলসা:

হযরত মসীহ মাওউদ (আ) তাঁর পুস্তক "আসমানী ফয়সালা" তে আঞ্জুমানের কাজের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার জন্য জামা'তের সদস্যগণকে দিক-নির্দেশনা দেন যে, তারা যেন ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে চলে আসেন। সুতরাং নির্ধারিত সেই তারিখে জামা'তের সদস্যগণ মসজিদে আকসা কাদিয়ানে উপস্থিত হোন। যোহরের নামাযের পরে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

জলসার প্রারম্ভে মৌলানা আব্দুল করিম শিয়ালকুটি সাহেব হযরত আকদাসের নতুন পুস্তক আসমানী ফয়সালা পাঠ করে শোনান। এরপর যারা যারা আঞ্জুমানের সদস্য, তাদের নিকট প্রস্তাব আহবান করা হয়, কিভাবে এই কার্যক্রম আরম্ভ করা যায়। সকল সদস্য এক বাক্যে বলেন,যত দ্রুত সম্ভব এই পুস্তক প্রকাশ করা উচিত। সেই সাথে বিরুদ্ধবাদীদের ঠিকানা সংগ্রহ করে আঞ্জুমানের সদস্যদের মনোনীত করে তাদের নিকট তা শ্রবন করানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এরপর জলসা সমাপ্ত হয় এবং জলসায় আগত মেহমানগণ হযরত আকদাসের সাথে মুসাফা করেন। এটি জামাতে আহমদীয়ার সর্বপ্রথম সম্মেলন বা প্রথম সালানা জলসা ছিল। এই জলসায় নিম্নবর্ণিত ৭৫ জন আহমদী অংশগ্রহণ করেন।

১) মুন্সি মোহাম্মদ অরোড়া সাহেব, কপুরথলা, ২) মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান সাহেব, কপুরথলা, ৩) মুন্সি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব কপুরথলা, ৪) মুন্সি মোহাম্মদ জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলা, ৫) মুন্সি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন সাহেব, লাহোর, ৬) মুন্সি মোহাম্মদ খান সাহেব, কপুরথলা, ৭) মুন্সি মোহাম্মদ সারওয়ার খান সাহেব, কপুরথলা, ৮) মুন্সি ইমদাদ আলী সাহেব, কপুরথলা, ৯) মৌলবী মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব, কপুরথলা, ১০) হাফেজ মোহাম্মদ আলী সাহেব, কপুরথলা, ১১) মির্যা খোদা বকস সাহেব, নবাব মালইয়ার কোটলা, ১২) মুন্সি রুস্তম আলী সাহেব, লাহোর, ১৩) ডিপুটি হাজী ফাতাহ আলী সাহেব, লাহোর, ১৪) হাজী খাজা মোহাম্মদ উদ্দিন সাহেব, লাহোর, ১৫) মিয়া মোহাম্মদ চিটু সাহেব, লাহোর, ১৬) মুন্সি তাজউদ্দিন সাহেব, লাহোর, ১৭) মুন্সি নবী বকস সাহেব, লাহোর, ১৮) হাফেজ ফজল আহমদ সাহেব,লাহোর, ১৯) মৌলবী রহিম উল্লাহ সাহেব, লাহোর, ২০) মৌলবী গোলাম হোসেন সাহেব, লাহোর, ২১) মুন্সি আব্দুর রহমান সাহেব, লাহোর, ২২) মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব, মসজিদ চিনইয়া, ২৩) মুন্সি করম ইলাহী সাহেব, লাহোর, ২৪) সৈয়দ নাসের শাহ সাহেব, লাহোর, ২৫) হাফেজ মোহাম্মদ আকবর সাহেব, লাহোর, ২৬) মৌলবী গোলাম কাদের সাহেব, শিয়ালকোর্ট, ২৭) মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব, শিয়ালকোর্ট, ২৮) মীর হামেদ শাহ সাহেব, শিয়ালকোট, ২৯) খলিফা রজব উদ্দিন সাহেব, লাহোর, ৩০) মুন্সি মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব, শিয়ালকোট, ৩১) হাকিম ফজলুদ্দীন সাহেব, শিয়ালকোট, ভেরা, ৩২) মিয়া নাজিমুদ্দীন সাহেব, শিয়ালকোট, ভেরা, ৩৩) মুন্সি আহমদ উল্লাহ সাহেব, জমুন, ৩৪) সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ সাহেব, জমুন, ৩৫) মিস্ত্রি ওমর উদ্দিন সাহেব, জমুন , ৩৬) মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব, জমুন, ৩৭) খলিফা নুরুদ্দীন সাহেব, জমুন, ৩৮) কাজী মোহাম্মদ আকবর সাহেব, জমুন, ৩৯) শেখ মোহাম্মদ জান সাহেব, উযিরাবাদ, ৪০) মৌলবী আব্দুল কাদের সাহেব, জামালপুর, ৪১) শেখ রহমত উল্লাহ সাহেব, গুজরাট,

৪২) শেখ আব্দুর রহমান বি.এ সাহেব, ৪৩) মুন্সি গোলাম আকবর সাহেব, লাহোর, ৪৪) মুন্সি দোস্ত মোহাম্মদ সার্জেন্ট সাহেব, জমুন, ৪৫) মুফতী ফজলুর রহমান সাহেব, জমুন, ৪৬) মুন্সি গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, লাহোর, ৪৭) শের শাহ সাহেব, জমুন, ৪৮) সাহেবজাদা ইফতিখার আহমদ সাহেব, লুধিয়ানা, ৪৯) কাজী খাজা আলী সাহেব, লুধিয়ানা, ৫০) হাফেজ নুর আহমদ সাহেব, লুধিয়ানা, ৫১) শাহজাদা হাজী আব্দুল মজিদ সাহেব, লুধিয়ানা, ৫২) হাজী আব্দুর রহমান সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৩) শেখ শাহাবুদ্দিন সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৪) মীর মাহমুদ শাহ সাহেব, শিয়ালকোট, ৫৫) হাজী নিযাম উদ্দিন সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৬) শেখ আব্দুল হক সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৭) মৌলবী মাহকুম উদ্দিন সাহেব, লুধিয়ানা, ৫৮) শেখ নুর আহমদ সাহেব, অমৃতসর, ৫৯) মুন্সি গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, ৬০) মিয়া জামালুদ্দিন সাহেব, শেখওয়াল, ৬১) মিয়া ইমামুদ্দিন সাহেব শেখওয়াল, ৬২) মিয়া খায়রুদ্দিন সাহেব, শেখওয়াল, ৬৩) মিয়া মোহাম্মদ ঈসা সাহেব, নওশহর, ৬৪) মিয়া চেরাগ আলী সাহেব, সাকিনথ গোলামনবী, ৬৫) শেখ শাহাবুদ্দিন সাহেব, সাকিনথ গোলামনবী, ৬৬) মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব, সাকিন সোহল, ৬৭) হাফেজ আব্দুর রহমান সাহেব, সাকিন সোহিয়া, ৬৮) দারোগা নেয়ামত আলী সাহেব, বাটালবী, ৬৯) হাফেজ হামেদ আলী সাহেব, বাটালবী, ৭০) হাকিম জান মোহাম্মদ সাহেব, ইমাম মসজিদ কাদিয়ান, ৭১) বাবু আলী মোহাম্মদ সাহেব, জমিদার বাটালা, ৭২) মির্যা ইসমাঈল বেগ সাহেব, কাদিয়ানী, ৭৩) মিয়া বুড্ডা খাঁ নম্বরদার সাহেব, বেইরী, ৭৪) মির্যা মোহাম্মদ আলী সাহেব, জমিদার পিট্টি, ৭৫) শেখ মোহাম্মদ ওমর সাহেব, বাটালা।

হযরত আকদাস (আ) ১৮৯১ সালে জলসার অব্যবহিত পরেই ইস্তেহারের মাধ্যমে জামা'তের সদস্যদেরকে সংবাদ দেন যে আগামী বছর থেকে প্রতি বছর ২৭,২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর তারিখে জামা'তে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে।

সালানা জলসা কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে:

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে ১৮৯২ সাল ছাড়া অন্যান্য জলসা মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। [১৮৯২ সালের জলসা ঢাপের পাড়ে অনুষ্ঠিত হয়]। খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রা.) র খেলাফতকালীন প্রথম পাঁচ বছর সালানা জলসা মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সালানা জলসা নুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে জলসায় লোকের আধিক্যের কারণে সে বছর কল্যানমন্ডিত সালানা জলসা নুর মসজিদের বাহিরে সামনের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মোট ২২ টি জলসা এ মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের জলসা মসজিদে আকসাতেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে বাবে আনোয়ারের পুরাতন জলসা গাহে জলসা সিফট করা হয়। সুতরাং কাদিয়ানের সালানা জলসা সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের তত্বাবধানে লাহোরে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৮ সালের সালানা জলসা ডিসেম্বর মাসের পরিবর্তে ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে রাবওয়ায় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অত:পর ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর নিয়মিত সালানা জলসা রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর ইংল্যান্ডে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়াও প্রতিবছর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এ জলসার আদলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই, যেখানে আহমদীয়া জামা'ত আছে, প্রতিবছর তাদের দেশীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং নিজেদের আধ্যাত্বিক উন্নতি সাধন।

সালানা জলসার গোড়াপত্তন বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়। কেননা, হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া সমগ্র দেশে বিরোধীতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। লাহোরের চিনইয়ান নামক মসজিদের ইমাম মৌলবী রহিম বখস সাহেব অত্যন্ত জোরে-শোরে এই ফতওয়া দেয়, এ ধরনের জলসায় যোগদান করা কেবল বেদাতই নয় বরং পাপ হবে। শুধু ধর্মীয় বিরোধীতা নয় বরং আর্থিক সংকটের কারণেও এই জলসা বাহ্যিক দৃষ্টিতে চালু রাখা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি পদে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) কে অদৃশ্য থেকে সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। লেখা দীর্ঘায়িত হওয়ার কথা চিন্তা করে এখানে কেবল দু' একটি ঘটনা পাঠকগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি। কপুরথলার মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব বর্ননা করেন, একবার সালানা জলসার সময় জিনিসপত্র ছিল না। সে যুগে সালানা জলসার জন্য চাঁদা জমা করা হত না বা উঠানো হত না। হুযূর (আ.) নিজের পক্ষ থেকেই ব্যয় নির্বাহ করতেন।

একবার মরহুম নাসের নবাব সাহেব এসে আবেদন করেন, মেহমানদের রাতে খাবারের জন্য কোন কিছু নেই। তিনি (আ.) বলেন ঘরে বিবি সাহেবার কাছ থেকে কোন অলংকার নিয়ে তা বিক্রি করে ব্যবস্থা কর।

সুতরাং মীর সাহেব অলংকার বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে মেহমানদের জন্য খাবারের জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। দুই দিন পরে মীর সাহেব পুনরায় উপস্থিত হয়ে বলেন, আগামীকালের জন্য খাবার কোন কিছু নেই। এ কথা শ্রবন করে হযরত আকদাস বলেন, আমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জাগতিক জিনিসপত্র দ্বারা যতটুকু ব্যবস্থা করার ছিল তা করেছি। এখন আর কিছু করার নেই, যার মেহমান তিনিই ব্যবস্থা করবেন। পরের দিন সকাল ৮/৯ টার সময় যখন ডাক পিয়ন আসে, তো হুযূর আমাকে এবং মীর সাহেবকে ডেকে পাঠান। আমরা গিয়ে দেখলাম ডাক পিয়নের হাতে ১০/১৫ টি মানি অর্ডার যা বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে। আর এগুলোতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ও একশত একশত টাকার মানিঅর্ডার রয়েছে। মানিঅর্ডার গুলোতে লেখা আছে, আমরা যেহেতু স্ব-শরীরে উপস্থিত হতে পারিনি, তাই মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য এ টাকা পাঠানো হলো। হযরত আকদাস টাকা রিসিভ করে আল্লাহ্‌র ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করার ওপর বলেন, কোন জাগতিক লোকের নিজ সিন্দুকে গচ্ছিত টাকার প্রতি তার ভরসা থাকে অর্থাৎ যখন খুশি সে তা বের করতে পারবে । যারা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, তারা এর থেকেও বেশী নিশ্চিত থাকে। তাদের সাথে এরূপই হয়। যখনই তাদের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, আল্লাহ্ দ্রুত তার ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেন।

১৯০৭ সালের সালানা জলসা

১৯০৭ সালের সালানা জলসা আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলসা। কেননা এটি হযরত ইমাম মাহদী (আ) র জীবনের শেষ জলসা।

মেহমানগণের আগমন: ১৯০৭ সালের সালানা জলসার উদ্দেশ্যে লোকেরা ১৯

ডিসেম্বর থেকেই আসতে আরম্ভ করে। দুই একজন বন্ধু এর পূর্বেও দারুল আমানে পৌঁছান। কিন্তু সবার আগে দো আলমিয়াল জামাত তাদের আমীর মৌলবী করম দাদ সাহেবের নেতৃত্বে কাদিয়ান পৌঁছান। এরপর দেশের চার দিক থেকে জলসার উদ্দেশ্যে অসংখ্য মেহমান আসতে আরম্ভ করে। ২৪ ডিসেম্বর এবং এরপর শিয়ালকোট, জমুন, ওযিরাবাদ, গুজরানওয়ালা, জেহলম, গুজরাত, লাহোর, অমৃতসর, কপুরথলা, লুধিয়ানা ,জলন্ধর, দিল্লি এবং দেশের অন্যান্য এলাকার জামা'ত সমূহ এসে পৌঁছায়। ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বরও অনেক বড় সংখ্যায় মেহমান আসেন।

২৫ ডিসেম্বর তাশহীযুল আযহানের জলসা:

২৫ ডিসেম্বর যোহরের নামাযের পর তাশহীযুল আযহানের একটি সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলাওয়াতের পরে হাফেজ আব্দুল করিম সাহেব বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন। এরপর সাহেবজাদা মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব তৎকালীন যুগের অবস্থা তুলে ধরে যুবকদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সৈয়দ ওলীউল্লাহ শাহ সাহেব (যিনি তখন তালীমুল ইসলামের ছাত্র ছিলেন) নিজের প্রবন্ধ পাঠ করেন। আকবর শাহ খান সাহেব ও নিয়ামত উল্লাহ সাহেব, উভয়ে নযম পাঠ করে শুনান। সবশেষে হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব 'প্রচারকের বৈশিষ্ট কিরূপ হওয়া উচিত'-এ ব্যপারে আলোচনা করেন। প্রচারককে পবিত্র হতে হবে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২৬ ডিসেম্বর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রাত:ভ্রমণের সময় ঈমান উদ্দিপক ঘটনা:

হযরত আকদাস ২৬ ডিসেম্বর সকালে প্রাত:ভ্রমনে বাহিরে বের হোন। খোদ্দামরা অতি উৎসাহের সাথে হযরতের সাথে সাক্ষাতের জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। এতবেশী লোক সমাগম ছিল যে প্রাত:ভ্রমনে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। হযরত আকদাস গ্রামের বাহিরে একটি গাছের নীচে দাড়িঁয়ে যান। আর সেখানে খোদ্দামদের সাথে প্রায় দুই ঘন্টা মসাফা করেন। সেই সময়ের দৃশ্য দেখার মত ছিল। সবাই চাচ্ছিল আমি সবার আগে যাব আর হযরতের সাথে সবার আগে সাক্ষাত করব। একজন গ্রামের লোক আরেকজনকে বলছে এ ভিড়ের মধ্যে জোর করে সামনে গিয়ে সাক্ষাত কর। আর এটা করতে গিয়ে যদি শরীর টুকরো টুকরোও হয়ে যায় তবুও তোয়াক্কা করবে না। যোহর ও আসরের নামায মসজিদে আকসায় আদায় করা হয়। নামাযের পরে মৌলানা নুরুদ্দিন সাহেব নিকাহর এলান করান। বিবাহের খুতবায় নিকাহর উদ্দেশ্যের ওপর একটি তাত্বিক বক্তব্য রাখেন। বিবাহের পরে মীর কাসেম আলী সাহেব একটি কল্যানমন্ডিত নযম পাঠ করেন।

২৭ ডিসেম্বর হযরত আকদাসের প্রথম বক্তব্য: ২৭ ডিসেম্বর মসজিদে আকসায় জুমুআর নামায আদায় করা হয়। জুমআর সময় মসজিদে আকসার ভিতর ও বাহির কানায় কানায় ভরে যায়। খোদ্দামরা আশপাশের দোকান ও বাড়িঘরের ছাদে এবং ডাক বিভাগের ছাদে জুমআর নামায আদায় করে। সামগ্রিক উপস্থিতি ছিল তিন হাজারের মত। হযরত মৌলবী নুরুদ্দিন সাহেব জুমআর খুতবা পড়ান। জুমুআর নামাযের সাথে আসরের নামাযও জমা করে আদায় করা হয়। অত:পর হযরত আকদাস খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে হৃদয়-স্পর্শি বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর তাঁর বক্তব্যে সূরা ফাতিহার সূক্ষ্ম তফসির বর্ননা করার পর জামা'তকে আত্মশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

তিনি বলেন, আত্মশুদ্ধি সেটাকে বলে যে ব্যক্তি সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের অধিকার আদায়কারী হবে। আল্লাহ্‌র অধিকার হচ্ছে যেভাবে আমরা মুখে ওয়াদা করি তার কোন শরিক নাই। অনুরূপভাবে তা যেন আমাদের আমল দ্বারাও প্রকাশ পায়। সৃষ্টিকে যেন তাঁর সমতুল্য কখনো মনে করা না হয় বা তাঁর সমকক্ষ দাড় করানো না হয়। সৃষ্টির অধিকার হচ্ছে কোনভাবেই যেন কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা না থাকে। নি:সন্দেহে খোদার অধিকার অনেক বড়, কিন্তু খোদার অধিকার আদায় হচ্ছে কি-না, তা বুঝার জন্য বান্দার অধিকার আদায় করাও জরুরী। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের সাথে সু-সম্পর্ক রাখে না, সে খোদার নিকট পরিস্কার থাকতে পারে না। হুযূর (আ.) বলেন :

দেখ, হযরত রসূলে করীম (সা) এর জামা'ত অসংখ্য বিজয় লাভ করেছে। এর কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে, তারা একদেহ একপ্রাণ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র ঘর সেটাকে বলা যাবে না, যেখানে প্রতিমা থাকে। আর মানুষের হৃদয় হচ্ছে খোদার ঘর। কিন্তু সেটাকে কেবল তখনই খোদার ঘর বলা যাবে, ফেরেশতা কেবল তখনই সেখানে প্রবেশ করবে, যখন মানুষের হৃদয় পরিস্কার হবে, পুত:পবিত্র হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় পরিস্কার হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমল সঠিক হতে পারে না। এখন উপযুক্ত সময়, যা কাজ করার করে নাও। কোথাও যেন এরূপ না হয় যে জাগতিকভাবেও বিরোধীতার সম্মুখীন হচ্ছ, আবার ধর্মও সঠিকভাবে পালন না করার কারণে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছ। কে জানে কখন কার ডাক আসবে। মৃত্যু তো সর্বদা লেগেই রয়েছে, তাই বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে চেষ্টা কর। বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে জামাতের সদস্যগণ হুযূরের সাথে মুসাফা করেন।

২৮ ডিসেম্বর হুযূরের ভ্রমন: ২৮ ডিসেম্বর হুযূর তার নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী প্রাত:ভ্রমণে বের হন। সেদিন জামাতের অনেক বড় সংখ্যা হুযূরের সাথে ছিলেন। ডা: ইয়াকুব বেগ সাহেব,চৌধুরী মাওলা বকস সাহেব, মালিক মোহাম্মদ হায়াত সাহেব, হাকিম মোহাম্মদ ওমর সাহেব এবং ডা: খলিফা রশিদ উদ্দিন সাহেব এত ভাল ব্যবস্থা করেন যে, জামাতের সকল সদস্যগণ হুযূরের সাথে খুব ভালভাবে আরামের সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আকদাস মাঠের একপাশে বসেন প্রথমে অমৃত সরের এক বন্ধু এবং পরে আবু ইউসূফ মৌলবী মোবারক আলী সাহেবদ্বয় নযম পাঠ করে শুনান।

হযরত আকদাস (আ.)-এর দ্বিতীয় বক্তব্য: এ দিন মসজিদে আকসায় যোহর ও আসরের নামায জমা হয়। এরপর হযরত আকদাস দ্বিতীয় বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের প্রারম্ভে হুযূর বলেন, "আমি গতকাল যে বক্তব্য দিয়েছিলাম, তার মাঝে কিছুটা অংশ বাকী রয়ে গেছে। কেননা শারীরিক অসুস্থ্যতার কারণে তা শেষ করতে পারিনি, তাই আজ আবার আরম্ভ করছি। কেননা মানব জীবনের কোন গ্যারান্টি নেই। যারা আজ এখানে উপস্থিত আছেন, জানিনা আগামী বছর কারা জীবিত থাকবেন আর কারা মৃত্যুবরণ করবেন। হুযূরের এই হৃদয়-স্পর্শি ও হৃদয়কে চুর্ণ-বিচুর্ণকারী কথার পরে নিজ খোদ্দামদের অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ধৈর্য্য ধারন করার কথা বলেন। এ ছাড়াও তিনি তাদেরকে আরো মূল্যবান নসিহত করেন। তার (আ.) এ মর্মস্পর্শি ও চিন্তার খোরাক বক্তব্য যে বাক্য দ্বারা সমাপ্ত

করেন, তা হচ্ছে, "প্রথমে কি একথা বলা হয় নাই যে, শেষ যুগে একটি শিঙ্গায় আকাশ থেকে ফু দেয়া হবে। সেটা কি খোদার ধ্বনী নয়? নবীগণ যখন আসেন, তখন তারা শিঙ্গায় ফুৎকার দেন। শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার এটাই অর্থ ছিল, তখন একজন প্রত্যাদিষ্টকে প্রেরণ করা হয়। তিনি তোমাদেরকে অবগত করবেন, এখন তোমাদের সময় এসে গেছে। কে কাকে সংশোধন করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তাকে সংশোধন না করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার নবীদেরকে এক প্রকার সুপ্ত-শক্তি দান করেন, যেন মানুষের হৃদয় তাঁর দিকে ঝুকে। আল্লাহ্‌র কাজ কখনো বিনষ্ট হয় না। একটি অলৌকিক শক্তি এ কাজ করে দেখাবে। এখন সেই সময় এসে গেছে, নবীগণ প্রথম থেকেই যার সু-সংবাদ দিয়ে আসছেন। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের সময় নিকটবর্তী, সেটাকে ভয় কর এবং তওবা কর। (বদর ১৪ জানুয়ারী ১৯০৮)

সদর আঞ্জুমানের সভা: সেই দিন ২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে মাগরিবের নামাযের পরে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর দুরান্ত থেকে আগত অধিকাংশ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণ সেই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেক্রেটারী সাহেবগণ বিভিন্ন বিভাগের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এরপর ১৯০৮ সালের বাজেট উপস্থাপন করা হয়। খাজা কামালুদ্দিন সাহেব বাজেট পেশ করার পরে বিভিন্ন জরুরী বিষয়ের ওপর সামগ্রিক আলোচনা করেন। এরপর মৌলবী নুরুদ্দিন সাহেব তার বক্তব্যে কুরআন করীমে কি ধরনের আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তা উল্লেখ করেন। তাঁর (রা.) বক্তব্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, কুরআন করীম হচ্ছে জ্ঞানের একটি সমুদ্র, এর মাঝে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয় বর্নিত রয়েছে।

বয়আত:

জলসার দিনগুলোতে বয়আতের ধারা অব্যাহত থাকে। কখনো বয়আতকারীর সংখ্যা এত বেড়ে যেত যে, মানুষের জন্য হযরত আকদাসের নিকট পৌঁছানো এবং নিয়ম অনুযায়ী হাতে হাত রেখে বয়াত করা অসম্ভব হয়ে যেত। এ কারণে লোকেরা নিজেদের পাগড়ী খুলে বিভিন্ন দিক থেকে হযরত আকদাসের দিকে নিক্ষেপ করত। এমন কি অনেকে একটি পাগড়ী আরেকটি পাগড়ীর সাথে বেঁধে দুর দুরান্ত থেকে ছুড়ে দিতেন। এক মাথায় বয়াতকারী ধরে রাখতেন আর অপর প্রান্তে যারা হুযূরের হাতে হাত দিয়ে বয়াত করতেন তারা ধরে রাখতেন। যারা সরাসরি হুযূরের হাতে হাত দিয়ে বয়াত করতে পারতেন না, তারা পাগড়ীর মাথা ধরে বয়আত করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। এভাবে লোকেরা অনেক বড় সংখ্যায় বয়াত করার জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিযোগীতা করতেন। এভাবে পাগড়ীর মাধ্যমে হযরত আকদাস ও বয়াতকারীর মাঝে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হত। বয়আতের সময় যেহেতু হযরত আকদাসের কথা দুর পর্যন্ত পৌঁছাতো না, তাই কিছু দুরে দুরে একজন করে খোদ্দাম দাঁড়ানো ছিল, যারা হযরত আকদাসের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতেন। এভাবে তারা বয়াতের কথাগুলো বয়াতকারী পর্যন্ত পৌঁছাতেন।

লঙ্গরখানার ব্যবস্থা এবং ইতয়ামুল জা'য়ে ওয়াল মু'তাবের এলহাম:

শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব,হাকীম ফজলুদ্দিন সাহেব, মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব,কাজী আমীর হোসেন সাহেব ও মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং ছাত্ররা সেচ্ছাসেবক হিসাবে অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে মেহমানদের খাবার খাওয়ান। কিন্তু ব্যবস্থাপনার ধারনার তুলনায় অনেক বেশী মেহমান উপস্থিত হয়। একদিন তো এমন হল যে যৌক্তিক কারণে বেশ কয়েকজন মেহমান অনেক দেরীতে রাতের খাবার পান। আবার অনেক মেহমান খাবারের দেরী দেখে না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই শুয়ে পড়েন। তারা না কারো কাছে কোন অভিযোগ করেছেন আর না সহানুভূতি লাভের আশায় কারো কাছে তা বর্ননা করেছেন। তাদের ধৈর্য্য ধারন করা এবং কারো কাছে বর্ণনা না করার কারণে আরশের খোদা নিজে ফেরেশতা দ্বারা ইলহাম করেন, "ইতয়ামুল জা'য়েউ ওয়াল মু'তাবের" অর্থাৎ ক্ষুধার্ত ও অসহায়দের খাবার খাওয়াও। এ ইলহামের পর হুযূর (আ.) সকাল সকাল খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন, কতিপয় মেহমান রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছেন। হুযূর (আ.) তখনই ব্যবস্থাপনাকে ডাকেন এবং তাদের তাকিদ করেন যেন মেহমানদেরকে ভালভাবে আদর আপ্যায়ন করা হয়, কারো যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

১৯০৭ সালের কয়েকজন সনামধন্য সাহাবী হচ্ছেন : ১) চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.), ২) হাজী আবু বক্কর ইউসূফ সাহেব (রা.), ৩) শেখ নিয়ায মোহাম্মদ সাহেব (রা.) [ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ]

[সংকলন: তারিখে আহমদীয়াত, ১ম ও ২য় খন্ড]

"ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁর সাথে মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে খোদার আদেশ লংঘন করে সে কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে না।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

অমুসলিমদের ওপর হামলা, কি বলে পবিত্র কুরআন

মাহমুদ আহমদ সুমন

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে। শত শত বছর ধরে এ দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়াই ছিল স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যায়, স্বাধীনতা-বিরোধী অপশক্তি বরাবরই এদেশের বিভিন্ন ধর্মীয়-সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয়-সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকারকে যেমন কঠোর প্রদক্ষেপ নিতে হবে, সেই সাথে দেশবাসীকেও এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী ধর্মকর্ম পালন করার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) যে ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম করেছিলেন, মদীনা সনদই তার স্পষ্ট প্রমাণ। সকলের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'জেনে রাখ, যে ব্যক্তি কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলিম ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তার ওপর সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দেবে বা তার অনুমতি ব্যতীত তার কোন বস্তু নিয়ে নিবে, আমি কেয়ামত দিবসে (আল্লাহ্‌র আদালতে) তার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করব' (আবু দাউদ)। অমুসলিমদের উপাসনালয়ে হামলা চালানোকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। শুধু তা-ই নয় বরং অমুসলিমরা যেসবের উপাসনা করে, সেগুলোকেও গালমন্দ করতে আল্লাহ পাক বারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন 'আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে উপাস্যরূপে ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। নতুবা তারা শত্রুতাবশত না জেনে আল্লাহ্‌কেই গালমন্দ করবে' (সূরা আন আম: ১০৮)। এ আয়াতে শুধু প্রতিমা-পূজারীদের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দান করা হয়নি, বরং সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কোন ধর্মের উপাসনালয় বা ঘর-বাড়ী জালিয়ে দেয়ার শিক্ষা ইসলামে নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমাজের সর্বক্ষেত্রে এবং সকল জাতির মাঝে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। এমন কি খ্রিষ্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয়-অধিকারকেও তিনি নিশ্চিত করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা যেন বলবত থাকে, সেই ব্যবস্থাও করেছেন।

খ্রিষ্টানদের নাগরিক ও ধর্মীয়-অধিকার নিশ্চিতকারী মহানবী (সা.) প্রদত্ত ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘোষণা পত্র : এটি মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.) প্রণীত কাছের এবং দূরের খ্রিষ্টীয় মতবাদ পোষণকারী প্রত্যেকের জন্য ঘোষণা পত্র : আমরা এদের সাথে আছি। নিশ্চয়ই আমি নিজে আমার সেবকবৃন্দ মদিনার আনসার এবং আমার অনুসারীরা এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি। কেননা খ্রিষ্টানরা আমার দেশের নাগরিক। আর আল্লাহ্‌র কসম! যা কিছুই এদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষতির কারণ হয়, তার ঘোর বিরোধী। এদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা যাবে না, এদের বিচারকদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যাবে না, আর এদের ধর্মযাজকদেরকেও এদের আশ্রয় থেকে সরানো যাবে না। কেউ এদের উপসনালয় ধ্বংস বা এর ক্ষতিসাধণ করতে পারবে না।

কেউ যদি এর সামান্য অংশও আত্মসাৎ

করে, সেক্ষেত্রে সে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। নিশ্চয়ই এরা (অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা) আমার মিত্র এবং এরা যেসব বিষয়ে শঙ্কিত, সেসব বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে এদের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। কেউ এদেরকে জোর করে বাড়ী ছাড়া করতে পারবে না অথবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেও এদের বাধ্য করা যাবে না। বরং মুসলমানরা এদের জন্য যুদ্ধ করবে। কোন খ্রিষ্টান মেয়ে যদি কোন মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ সে মেয়ের) অনুমোদন ছাড়া এটি সম্পাদিত হতে পারবে না। তাবে গির্জায় গিয়ে উপাসনা করতে তাকে বাধা দেয়া যাবে না।

এদের গির্জাগুলোর পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এগুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধা দেয়া যাবে না। আর এদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর পবিত্রতা-হানী করা যাবে না। এ ঘোষণা পত্র কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই উম্মতের সদস্য লঙ্ঘন করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : [মূল ঘোষণা পত্রটি ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী সম্রাট সুলতান সেলিম (১ম) নিয়ে যান এবং বর্তমানে সেটি ইস্তাম্বুলের টপক্যাপি যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। সুলতান সেটির একটি অনুলিপি খ্রিষ্টান পুরোহিতদেরকে প্রদান করেন এবং এতে বর্ণিত যাবতীয় শর্তাবলী অনুমোদন করেন। সেইন্ট ক্যাথেরিন আশ্রমের সংগ্রহশালায় যেসব প্রাচীন দলিল ও নথিপত্রের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে, তা থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.) প্রদত্ত ধারাগুলো যুগে যুগে বলবৎ থেকেছে এবং বাস্তবায়ন হয়ে এসেছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে বিধিবিধান এই ঘোষণা পত্রে প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো ১৪ 'শ বছর ধরে বাস্তবায়িত হয়ে এসেছে।]

[অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী (সা.) ১৪১৬ হিজরী, ১০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা, ১ম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯৫]

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এদেশকে স্বাধীন করেছে আমাদের পূর্ব পুরুষরা। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে, এই লক্ষ্যই ছিল স্বাধীনতার। আমরা জানি, ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় চার মুলনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সেখানে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'-র ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেন- "ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার মত ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হল, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর ধরে আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।" (তথ্য-'বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ' পুস্তক-পৃষ্ঠা-৮-১২)

ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক ৭ জুন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন "বাংলাদেশের মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্ম নিরপেক্ষতা আছে। এর একটা অর্থ আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা করা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না" (বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ)।

এতগুলো বছর অতিক্রম করার পরেও এদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করা হয়। তাদের ঘর-বাড়ী, উপাসনালয় জালিয়ে দেয়া হয়। এসব কি ইসলামের শিক্ষা? ধর্মের লেবাস ধারণ করে যারা আজকে ইসলামের কথা বলছে, তাদের মাঝে প্রকৃত-ইসলামের কোন শিক্ষা পাওয়া যায় কি? ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এটা প্রত্যেক মানুষকে ধর্মীয়-স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা কেবল ধর্ম-বিশ্বাস লালন-পালন করার স্বাধীনতা নয় বরং ধর্ম না করার বা ধর্ম বর্জন করার স্বাধীনতাও এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'তুমি বল, তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য সমাগত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক' (সূরা কাহাফ : ২৯)।

সত্য ও সুন্দর নিজ সত্তায় এতই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে যে যার কারণে মানুষ নিজে নিজেই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। বলপ্রয়োগ বা রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করে সত্যকে সত্য আর সুন্দরকে সুন্দর ঘোষণা করানো অজ্ঞতার পরিচায়ক। ফার্সিতে বলা হয়, সূর্যোদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই নিয়ে গায়ের জোর খাটানোর বা বিতন্ডার অবকাশ নেই। সূর্যোদয় সত্বেও কেউ যদি সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাকে বোকা বলা যেতে পারে কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কিছুই নেই। ঠিক তেমনি, কে আল্লাহকে মানলো বা না মানলো, কে ধর্ম করলো বা না করলো, এটা নিয়ে এ জগতে বিচার বসানোর কোন শিক্ষা ইসলাম ধর্মে নেই। বরং এর বিচার পরকালে আল্লাহ নিজে করবেন বলে তাঁর শেষ শরীয়ত গ্রন্থ আল কুরআনে বার বার জানিয়েছেন। এ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে সমাজে আস্তিকও থাকবে, নাস্তিকও থাকবে। মুসলমানও থাকবে হিন্দুও থাকবে এবং অন্যান্য মতাবলম্বীরাও থাকবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনা করার ইসলামী শিক্ষা কি, আর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে ইসলাম কি বলে, তাও জানা প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নীতি। এর অর্থ ধর্মহীনতা বা ধর্ম বিমুখতা

কে আল্লাহ্‌কে মানলো বা না মানলো, কে ধর্ম করলো বা না করলো, এটা নিয়ে এ জগতে বিচার বসানোর কোন শিক্ষা ইসলাম ধর্মে নেই বরং এর বিচার পরকালে আল্লাহ্ নিজে করবেন বলে তাঁর শেষ শরীয়ত গ্রন্থ আল কুরআনে বার বার জানিয়েছেন। এ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে সমাজে আস্তিক, নাস্তিক, মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান এবং অন্যান্য মতাবলম্বীরা সবাই থাকবে।

নয়। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নায়করা নাগরিকদের ধর্ম বা বিশ্বাসের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন। কে কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী বা কে অবিশ্বাসী অথবা নাস্তিক, এ বিষয়ে রাষ্ট্র-যন্ত্র কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, সবাই রাষ্টের দৃষ্টিতে সমান-এই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা।

পূর্ণ নিরপেক্ষতা ছাড়া পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচার সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মের এই অমোঘ শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনে। মক্কার নির্যাতিত অবস্থা থেকে মুক্তি চেয়ে ধর্মীয়-স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় তিনি মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় পৌঁছানোর পর মদীনার ইহুদী ও অন্যান্য ধর্ম-গোষ্ঠী ও গোত্রের সাথে তিনি একটি 'সন্ধি' করেন। এই সন্ধি 'মদীনা সনদ' নামে খ্যাত। 'মদীনা সনদের' প্রতিটি ছত্রে সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সমান নাগরিক-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে এক জাতিভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মদীনা সনদের ২৫ নম্বর ধারায় ধর্ম নিরপেক্ষতার একটি বিরল উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে বলা হয় : বনু আওফ গোত্রের ইহুদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইহুদীদের জন্য ইহুদীদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ধর্ম। একই কথা এদের মিত্রদের এবং এদের নিজেদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যে অত্যাচার করবে এবং অপরাধ করবে, সে কেবল নিজেকে এবং নিজ পরিবারকেই বিপদগস্থ করবে।

একটু ভেবে দেখুন, কি চমৎকার শিক্ষা! বিশ্বনবী, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, যে যে ধর্মেরই হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জাগতিক অবস্থান সমান। এটি নিছক একটি ঘোষণাই ছিল না। বরং মহানবী (সা.) মদীনার শাসনকাজ পরিচালনাকালে এর সুষ্ঠ বাস্তবায়নও করেছিলেন। একবার মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিয়ে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদীর মাঝে বাক-বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে বিতন্ডা তিক্ততার স্তরে উপনীত হলে সেই ইহুদী মহানবী (সা.)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। মহানবী (সা.) নিরপেক্ষ শাসক হিসেবে রায় দিয়ে বলেন, তোমরা আমাকে মুসার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭)। এর অর্থ হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগতে কে শ্রেষ্ঠ আর কে শ্রেষ্ঠ নয়, এটা মানুষের সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। অতএব এ নিয়ে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করতে যেও না। ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামের শিক্ষানুযায়ী দ্ব্যার্থহীনভাবে সাব্যস্থ। ইসলাম এমন একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, যা সর্বক্ষেত্রে শান্তির বিধান নিশ্চিত করে। ইসলাম হচ্ছে শান্তির অপর নাম। শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম মানুষের জীবনে শান্তির বন্যা নিয়ে আসে আর প্রবাহিত করে শান্তির বায়ু। আর এ শান্তির বায়ু মানুষের দেহের সুস্থতায়, মানুষের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যে, মানুষের মনে এবং তার আত্মায় এককথায় বলা যায় সর্ব দিক দিয়ে মানুষকে সতেজ করে।

পরিশেষে বলবো, যারা কুরআন ও আল্লাহ্ রাসূলের শিক্ষা পরিপন্থি কাজ করে তারা ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। তাই যারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দেশের শান্তি বিনষ্ট করছে, তাদের ব্যাপারে সরকারকে যেমন অনেক বেশি কঠোর হতে হবে, তেমনি দেশবাসীকেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। গুটিকতক উগ্রপন্থিদের দ্বারা দেশের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোক, এটা কারো কাম্য নয়। এই ধর্মান্ধদের জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছে এই দোয়াই করি, তিনি যেন তাদের মস্তিষ্কে প্রকৃত-ইসলামের শিক্ষা প্রবেশ করিয়ে দেন এবং এক ঐশী নেতৃত্বের অধিনে থেকে জীবন পরিচালনা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

masumon83@yahoo.com

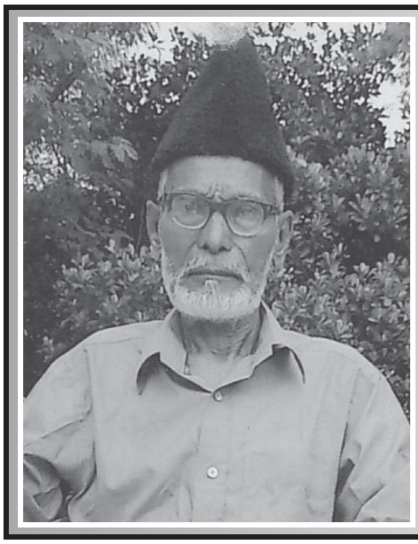

কলম সৈনিক রঙ্গু চৌধুরী স্মরণে

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আহমদীয়া মসলিম জামা'ত বাংলাদেশের প্রবীন বুযুর্গ জামা'তের বিশিষ্ট লেখক সরফরাজ এম এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী সাহেব গত ১৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ রাত ৯:৩০ মিনিটে আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ বিধানে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার রূপসা গ্রামে মাতুলয়ে ১৯২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফলে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁর পিতার নাম সরফরাজ মমিন উদ্দিন চৌধুরী এবং মাতা ইয়াকুদ বানু (লিলি)। তাঁর পৈত্রিক নিবাস রূপসা গ্রাম সংলগ্ন আহুতিয়া গ্রামে।

তাঁর মাতা-পিতার দাম্পত্ত জীবনে দীর্ঘ দিন সন্তান না হওয়ার পর অনেক দোয়ার ফলশ্রুতিতে রমযান মাসে তাঁর জন্ম হয়। ফলে তাদের বুকটা ভরে যায়। মায়ের কোলে যেন রমযানের চাঁদ নেমে আসে। তাই তাঁর ডাক নাম রাখা হয় রমযান।

তিনি শৈশব থেকে মাহে রমযানের ফজিলতে ধার্মিকতার মাঝে বড় হন। গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় ভালো মানুষ হিসেবে সকলের স্নেহ-ভাজন হয়ে উঠেন। জাগতিক শিক্ষায় মেট্রিক পাশ করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। তখন পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে চাকুরি করেছেন। সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবিরোধ এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ফেরকা প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আহরণে গবেষণা করেন। অবশেষে আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হন। প্রকৃত ইসলামের সিরাতাল মোস্তাকীম লাভের আশায় সত্যতা যাচাইয়ে অনুপ্রেরণা জন্মে। অত:পর বিভিন্ন সময় তিনি হযরত রাসূল করীম (সা.), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)কে স্বপ্নে দেখেন। ফলে আহমদীয়াতের সত্যতার প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। দোয়া করতে থাকেন। তখন কটিয়াদীর শামসুল হক ওরফে মেন্দী মিঞা, মির্যা আলী আখন্দ, মৌলবী আবু মুসা এবং মৌলবী আবু তাহের সাহেবের সংস্পর্শ লাভ করে তাদের তবলীগে এবং আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের রচিত হাদীসুল মাহ্দী গ্রন্থটি পাঠ করে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা তাঁর মাঝে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। ফলে ১৯৪৯ সালে তিনি বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলাহ দাখিল হন।

তিনি বয়আত করার পর প্রচন্ড মোখালেফাতের সম্মুখীন হন। আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন ভাবে তাঁর ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে। কিন্তু তিনি সকল বিরোধিতাকে ঈমানের পরীক্ষার সোপান হিসেবে বরণ করে নেন। অবশেষে বাড়ি ছেড়ে ঢাকার দারুত তবলীগে চলে আসেন এবং জামা'তের খেদমতে নিজেকে নিবেদন করেন। তখন জামা'তের বিভিন্নমুখী কাজের মধ্যে তবলীগই ছিল তার স্বপ্ন-সাধনা। দিনরাত তবলীগ করতেন। জামা'তের বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কয়েক বছর পর এক আহমদী ভ্রাতার পরামর্শ ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সন্তোষপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

১৯৬১ সালে তিনি ডি এইচ এম এস ডিগ্রী লাভ করে সন্তোষপুরে ডাক্তারী শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন দক্ষ হোমিও ডাক্তার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। তিনি দোয়া ও দাওয়া উভয় দিতেন। ফলে অনেকে তার মাধ্যমে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার আরোগ্যের সুযোগ পান। সন্তোষপুর গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে তিনি কয়েকজন সমাজ সেবককে নিয়ে ১৯৬৪ সালে সন্তোষপুর প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ স্কুলটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল হিসেবে স্বীকৃত। এ স্কুলটি তিনি প্রতিষ্ঠাতার শুরু থেকে শিক্ষকতা করে একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠে পরিণত করেন। তাই এলাকার লোকজনের নিকট তিনি সাত্তার মাষ্টার ও সাত্তার ডাক্তার নামে সুপরিচিত ছিলেন।

আহমদীয়া জামা'তের লেখালেখিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ষাট দশকের প্রথম দিক থেকে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি কল্পে কলম সৈনিক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং আজীবন লিখে গেছেন। পাক্ষিক আহমদীতে তাঁর অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে পাক্ষিক আহমদী তাঁর লেখায়

অনেক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। পাঠক সমাজে অনেক সমাদৃত হয়। ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত ৪৭তম সালানা জলসায় মোহাম্মদ ওসমান গনী ও আব্দুর রহিম শহীদ হওয়ার পর তিনি প্রথম কবিতা/নযম লিখেন। 'রচি তারি গান' শিরোনামে লিখিত কবিতাটি পাক্ষিক আহমদীর ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ ও ৩১ জানুয়ারী ১৯৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তাঁর লেখালেখি জীবনের প্রথম দিক থেকে তিনি কবিতা লিখতেন। তাই একবার প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব তাঁকে বলেন–রঙ্গু চৌধুরী তুমি অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখছো। তবে পাঠক সমাজে প্রবন্ধের তুলনায় কবিতার আবেদন কম। কাজেই কবিতার পরিবর্তে প্রবন্ধ রচনায় আত্ম নিয়োগ করলে ভাল হয়। জামা'ত বেশি উপকৃত হবে। অত:পর তিনি প্রবন্ধ লেখায় মনোনিবেশ করেন এবং আমরণ লিখে গেছেন।

জামা'তে আহমদীয়ার এ প্রবীন বুযুর্গ বাংলাদেশের আহমদীয়া জামা'তের শতবর্ষের ইতিহাস বর্ণনায় জ্ঞানী ছিলেন। কোন্ জামা'ত কখন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জামা'তের প্রবীন বুযুর্গরা কে কেমন ছিলেন ইত্যাদি অনেক কথা তিনি অনর্গল বলতেন। তাই তার জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমি তাঁকে বিভিন্ন জামা'তের ইতিহাস সমৃদ্ধ লেখা পাঠাতে অনুরোধ করি। ফলে তিনি কয়েকটি জামাতের ইতিহাস রচনা করে প্রেরণ করেছেন। যা পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়।

আমি বিভিন্ন জামা'তের ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্ত জানার জন্য মাঝে মধ্যে চৌধুরী সাহেবের সাথে টেলিফোনে আলাপ করতাম। তিনি অনর্গল বলতেন। ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের আহমদীয়াতের শতবর্ষের ইতিহাস রচনার প্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবো। কিন্তু আমি দুর্ভাগা বলেই যাওয়া হয়নি। সেজন্য দুঃখও আফসোস হয়। আমরা আমাদের এক ইতিহাসবেত্তাকে হারালাম।

তিনি সন্তোষপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র দীর্ঘদিন যয়ীম এবং স্থানীয় জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। সদালাপী, দোয়ার পাগলা ও জ্ঞানবান এ ব্যক্তিটি সকলের আপনজন ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালে বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম সুষমা এদিব চৌধুরী। তিনি দুই মেয়ে তিন ছেলের জনক। তাঁর এক ছেলে রেজভি মাহমুদ চৌধুরী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশে কর্মরত আছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এ বুযুর্গ ব্যক্তিকে জান্নাতের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

"যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সাথে খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নহে।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

ঐশী খিলাফতের আনুগত্য মু'মিনদের জন্য ফরয

এস. এম. মাহমুদুল হক

অধ:পতিত মানবতা, মনুষত্ব ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বহুত্ববাদকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা যুগে যুগে, গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর বিশ্বব্যাপী একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিশ্ববিজয়ের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক জগতের মহানায়ক দু জাহানের বাদশা, মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র অধ:পতিত মানবজাতির কান্ডারী, আমাদের আকা ও মওলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)কে আল্লাহ্ তাআলা প্রেরণ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী যে, তার আধ্যাত্মিক প্রভাবে পশুতুল্য মানুষ আল্লাহ্ তাআলার প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়েছেন। অমানিশার চরম অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া এক জাতিকে ইসলামের অনুসরণকারী এক উত্তম জাতিতে পরিণত করেছেন।

ইসলাম পৃথিবীর বুকে যত দিন থাকবে, এই জাতি মুসলিম উম্মাহর অনুসরণ-যোগ্য জাতি হিসেবে প্রেরণা যোগাবে। সেই পবিত্র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পর আল্লাহ্ তাআলা তার সুন্নত অনুযায়ী আধ্যাত্মিক মহাযাত্রাকে প্রবহমান রাখার জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

খলীফা মনোনীত করা আল্লাহ্‌র কাজ। এই চিরন্তন সত্য কথাটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ বুঝে না। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬নং আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, খলীফা নির্বাচন করা আল্লাহ্‌র কাজ। আল্লাহ্ যাকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন, মু'মিনরা তাকেই খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেন, তার হাতে বয়আত নেন। আর এজন্যই খলীফাকে আমীরুল মু'মিনীন বলা হয়। আমীরুল মু'মিন অর্থ হলো মু'মিনদের নেতা। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মু'মিন আর মুসলমান এক জিনিস নয়। মু'মিনদের জীবন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পরিচালিত এবং আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত মু'মিনের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। কলেমার ওপর ঈমান আনলেই কেউ মু'মিন হয়, কিন্তু শুধু কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হওয়া যায় না।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার জীবদ্দশাতেই জানতেন তার ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলীফা হবেন। রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি আবু বকরকে আমার পর (খলীফা) নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পরে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে এটা আল্লাহ্‌র কাজ। আল্লাহ্ কখনো আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা করবেন না। আর মু'মিনদের জামা'ত ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আবু বকর ব্যতিত অন্য কারো খিলাফতে সন্তুষ্ট হবে না। (বুখারী)

এই হাদীস দ্বারা এটি প্রমণিত হয় যে, আল্লাহ্ যাকে খলীফা করতে চান, মু'মিনদের জামা'তও তাকে ছাড়া অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা মু'মিনের অন্তর আল্লাহ্‌র আসন এবং সেখান থেকেই তিনি মু'মিনদেরকে ওয়াজিবুল এতায়াত নেতা দিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা 'আতি উল্লাহা ও আতিউর রাসূলা ও উলিল আমরে মিনকুম' (সূরা নিসা) নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল, উম্মতের উলির আমরদের এতায়াত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয করেছেন।

রাসূল পাক (সা.) এরশাদ করেছেন, পছন্দ হোক বা না হোক, মুসলমানদের জন্য আমীরের এতায়াত করা ফরয। (বুখার, মুসলিম, আবু দাউদ, নেসাই ইবনে মাজাহ)

যুগ-খলীফা হলেন মু'মিনদের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। কোন মু'মিন মুসলমান খলীফার আনুগত্য ব্যতিরেকে তার ঈমানকে সতেজ রাখতে পারে না। যুগ খলীফা আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত সেই সূর্য, যার দ্বারা তার আনুগত্যকারী জামা'তের প্রতিটা সদস্য আলো পেয়ে থাকেন। যুগ খলীফার আনুগত্য ব্যতিরেকে কেউ এই আলো লাভ করতে পারে না।

একথা ভাল করে মনে রাখা প্রয়োজন নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মৃত্যু পর্যন্ত যেমনভাবে নবীকে উম্মতের কান্ডারী হয়ে থাকতে হয়, তেমনই খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর খলীফাকেও আমরণ তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলতে হয়। কোন মানুষ যেহেতু খলীফা নিযুক্ত করে না, সেজন্য মানুষের পক্ষে খলীফাকে পদচ্যুত করাও সম্ভব নয়। খোলাফায়ে রাশেদীন আমরণ খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খলীফার পদ কেউ কেড়ে নিতে চাইলেও খলীফা এ পদ ছাড়তে পারেন না। কেননা এ দায়িত্ব আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "রাসূল করীম (সা.) হযরত উসমান (রা.)কে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে একটি পোষাক দ্বারা সজ্জিত করবেন। যদি তা কেউ খুলে নিতে চায়, খুলে দিও না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হাদীসবিদগণের সম্মিলিত অভিমত এই যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত পোশাকের অর্থ হল খিলাফত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী ভয়াবহ বিপদের মুখে জীবন বিপন্ন জেনেও হযরত উসমান (রা.) পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। পদত্যাগের দাবীর জবাবে তিনি বলেন, "আমি কি তলোয়ারের বলে খলীফা হয়েছি যে, তোমরা তরবারির ভয় দেখিয়ে আমাকে খলীফার পদ থেকে অপসারণ করবে? (তাবাকাত ইবনে সাদ, জিলদ, ৩ পৃষ্ঠা ৬৮)

সেই দিন আল্লাহ্‌র খলীফার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দ্বারা ইসলামের এক কাল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের ৩ জন খলীফাকে শহীদ করা হয়েছিল। আর আধ্যাত্মিক জগতের মহা নায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র ওফাতের পর মাত্র ৩২ বছর খিলাফতের ঐশী সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কি কারণে মাত্র ৩২ বছর পর খোলাফায়ে রাশেদার সমাপ্তি হল? উত্তর সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতে। যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে "তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং

সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা বানিয়েছিলেন।

এ আয়াতে খিলাফতের ঐশী নেয়ামত তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার করা হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে। এ শর্ত যেখানে পূরণ হবে না, খিলাফত সেখানে থাকতে পারে না। আর খিলাফত থাকলেও তা টিকবে না তার প্রমাণ খোলাফায়ে রাশেদীন।

১৯০৬ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়া' নামে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তিনি এই আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন হযরত হেকীমন নূরুদ্দীন (রা.)-কে। খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পরেও হযরত নূরুদ্দীন (রা.) এ পদে থেকে যান। খিলাফতকে যারা খাটো করার দুরভিসন্ধি পোষণ করতো, তারা কৌশলে এ নাপাক ধারণা প্রচার করতো যে, আসল অথরিটি আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্টের, খলীফার নয়। ফিৎনা জটিল আকার ধারণ করলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন আর বলেন, "আমি খলীফাতুল মসীহ্ এবং খোদা আমাকে এ মর্যাদায় নিযুক্ত করেছেন।" তিনি আরও বলেন, "কাউকে খলীফা বানানো মানুষের কাজ নয় বরং এটা খোদা তা'লার কাজ। যে ব্যক্তি বলে সে আমাকে খলীফা বানিয়েছে, সে মিথ্যা বলে।" তিনি বলেছেন "আমি তোমাদেরকে স্মরণ করাতে চাই যে, কুরআন করীমে পরিষ্কার ঘোষণা করা আছে, আল্লাহ্ই খলীফা নিযুক্ত করেন। মনে রাখবে, আদমকে খলীফা করেছিলেন খোদা এবং বলেছিলেন ইন্নী জায়েলুন ফিল আরদে খলীফা...।

যদি কেউ বলে আঞ্জুমান আমাকে খলীফা বানিয়েছেন, তবে সে মিথ্যা বলে। খোদা তা'লা আমাকে খলীফা বানিয়েছেন। এখন না তোমরা কেউ আমাকে সরাতে পারবে, আর না আমাকে সরাবার কারো কোন ক্ষমতা আছে। "আমার সাথে লড়াই করার অর্থ খোদার সঙ্গে লড়াই করা।"

খিলাফতে আহমদীয়ার যাত্রা শুরুর পর যারা ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করতে খিলাফতকে অস্বীকার করেছিল, আহমদীয়াতের ইতিহাস সাক্ষী, তাদেরকে আস্তাকুড়ে নিপতিত হতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র এই আদেশ রয়েছে, "এবং তোমরা সকলে সমবেত ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে (খেলাফত) দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

সুতরাং আল্লাহ্র আদেশ, খেলাফতের ঐশী-রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে, ফারাক সৃষ্টি করা যাবে না। আজ জামা'তে আহমদীয়ার প্রত্যেক মু'মিন আহমদী মুসলমান এ কথা জানে খলীফার আনুগত্যের মাঝেই তাদের জীবন নিহিত। আর তাই হাজার হাজার পিতামাতা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে যুগ-খলীফার দরবারে পেশ করে এ অঙ্গীকার প্রকাশ করেছেন যে, আপনার আনুগত্যে আমরা আমাদের কলিজার টুকরো পেশ করলাম, প্রয়োজনে আমাদের জীবনও আপনার জন্য, খিলাফতের আনুগত্যে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত আছি।

খলীফার আনুগত্যে আহমদীদের ঈমান এতটাই বলীয়ান যে, বিরুদ্ধবাদীদের শত নির্যাতন, যুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে, প্রয়োজনে জীবন দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু ঐশী খেলাফতের নেয়ামত হতে বঞ্চিত হতে প্রস্তুত নয়।

আহমদীয়া জামা'তের খলীফার আনুগত্যে ঈমানের বলে বলিয়ান এক সময়ের কথা শুনুন :- লাহোর মসজিদে জুমুআর নামায পড়তে গিয়ে যার স্বামী শাহাদত বরণ করেছিলেন, তিনি তার ১০ বছরের ছেলেকে পরের শুক্রবার মসজিদে জুমুআর নামাযে প্রেরণ করে ছেলেকে এ নসীহত করেন, 'তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, যেন তোমার হৃদয়ে একথা দৃঢ়তার সাথে প্রোথিত হয় যে, আমার বাবা এক মহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন দিয়েছেন।'

আজ আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি আহমদীয়া খেলাফত মু'মিনদের এক জামা'ত দ্বারা এমন ভাবে সুরক্ষিত যে, ভিতরের মুনাফেক আর বাইরের শত্রু যতই চেষ্টা করুক না কেন, খিলাফতের এক বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করার ক্ষমতাও তাদের নেই। আহমদীয়াতের ইতিহাস সে প্রমাণই বহন করে।

সুতরাং হে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিটি সদস্য, আজ এই অঙ্গীকার করুন, আমরা আহমদীরা খেলাফতের আনুগত্যে নিজেদের জীবনকে এমনভাবে সজ্জিত করবো যা শত্রুর শত যুলুম নির্যাতন খিলাফতের ঐশী আনুগত্য হতে আমাদেরকে সামান্য পরিমাণ টলাতে পারবে না। আমরা আনুগত্যের এমন উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করবো, যা পৃথিবীতে আহমদীয়া খেলাফতের ঐশী ধারা কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রবাহিত রাখবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

১৯৯০ সনে চুয়াডাঙ্গায় কায়েদ সম্মেলন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মোহাম্মদ বশীর উদ্দীন, মিরপুর

১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত কায়েদ সম্মেলনের গ্রুপ ছবি

'যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হতে পারে না'-এই মূল্যবান উক্তিটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ১৯৩৮ সালে তিনি ঐশী প্রেরণায় রুহানী জামা'তের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত যুবকদের জন্য গঠন করেন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া। সকল আহমদী যুবক, কিশোর এবং শিশুদের সমন্বয়ে গঠিত এই মজলিস। আদর্শের দিক থেকে, নি:স্বার্থ সেবার দিক থেকে, শৃঙ্খলার দিক থেকে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সমকক্ষ একটি সংগঠন বিশ্বের কোথাও নাই। সকল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা এবং ইসলামের পূর্ণ প্রচারই জামা'তে আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের প্রায় সকল মজলিস তবলীগের কাজে জড়িত।

১৯৭৯-৮০ সালে চুয়াডাঙ্গা জামা'তের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আবুল খালিদ সাহেবের তত্বাবধানে রবিউল হক সাহেব অত্র জামা'তের খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ মনোনীত হন এবং তিনি মজলিস পুনর্গঠন করে আশেকুর রহমান, আব্দুল মান্নান, সাইফুল ইসলাম, নাতেকুর রহমানদের নিয়ে আমেলা গঠন করলে চুয়াডাঙ্গা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া একটি শক্তিশালী সংগঠন হয়। মাসে ২টি আমেলা মিটিং ও ২ টা সাধারণ মিটিং এর ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে সংগঠনটি সব সময় চাঙ্গা থাকত। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত রবিউল হক সাহেব মজলিসের সকল সদস্যদের সহযোগিতায় অতি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আব্দুল মান্নান কায়েদ নির্বাচিত হন। তিনি কায়েদের দায়িত্ব পাওয়ার পর সাধ্যমত দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করেছেন। চাকুরীরত থাকা অবস্থায় সময়ে সময়ে শারিরীক অসুস্থ অবস্থার কারণে কায়েদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা সত্ত্বে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ মজলিসের ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী সাহেবের নির্দেশক্রমে রবিউল হক সাহেব পুনরায় উক্ত মজলিসের কায়েদ নির্বাচিত হন। রবিউল হক সাহেব পুনরায় কায়েদের দায়িত্ব পাওয়ার পর আমেলা গঠন করেন। আমেলার সদস্যগণ হলেন আশেকুর রহমান, আব্দুল মান্নান, নাতেকুর রহমান ও সাইফুল ইসলাম। পরবর্তীতে জিয়াদ আলী সাহেব ও জুলফিকার আলী হায়দারকে মজলিসের আমেলার সদস্য করা হয়।

মজলিসের আমেলার সদস্য ও সাধারণ সদস্যরা কায়েদ সাহেবকে আন্তরিকতার সাথে সকল কাজে সহযোগিতা করার ফলে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্জুমান-এ-আহমদীয়ার সেক্রেটারী সাহেবের ১৯৮৭ সালের ২৭শে জুনের পত্র মোতাবেক রবিউল হক সাহেবকে স্থানীয় চুয়াডাঙ্গা আঞ্জুমানের অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী পদে নির্বাচনের অনুমোদন সংবাদ পাওয়া যায়। চুয়াডাঙ্গা জামা'তের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আবুল খালিদ সাহেবের অসুস্থতার কারণে ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল আমীর জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশে জনাব মাসুম আলী সাহেব চুয়াডাঙ্গায় স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাসুম আলী সাহেব জামা'তের একজন নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন এবং বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মাসুম আলী সাহেব আহমদী হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজ স্ত্রী-সন্তান আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে

১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবলী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ছবি

কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা জামা'তের আরো যারা নিবেদিত-প্রাণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক বুযুর্গ ছিলেন, তাঁরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জামা'তের প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট মুসলিম বারি সাহেব অধ্যাপক আবুল খালিদ সাহেব ডা: জারজিস আলী সাহেব, আব্দুল আজিজ সাহেব ও আরো অনেকে। ১৯৮৮ সালের দিকে মাসুম আলী সাহেব শারিরীক অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা জানিয়ে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট পত্র লিখেন। ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশে জনাব রবিউল হক ৭/১০/১৯৮৮ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রবিউল হক সাহেব প্রেসিডেন্টের গুরু দায়িত্ব পাওয়ার পর তালিম তরবিয়ত ও তবলীগের প্রতি আরো বেশী গুরুত্ব দিলেন। ১৯৮৯ সালে শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জামা'তসহ কুষ্টিয়া নাসেরাবাদ, উথলী শৈলমারী, বটিয়াপাড়া, আলমডাঙ্গা সহ ৭টি জামা'তকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ডেকেরোটর দিয়ে সুন্দর প্যান্ডেল করা হয়। সাউন্ড বক্সের ব্যবস্থা করা হয়।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে প্রতিটা জামা'ত থেকে ভ্রাতারা আসেন। শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠানটি ছিল পুরা জলসার মত। শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠানটি হওয়ার পর থেকে চুয়াডাঙ্গা সহ আশে-পাশের গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের প্রচার ও প্রসার আরো বৃদ্ধি পায়। আহমদীয়া জামা'ত সম্বন্ধে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯০ সালে জনাব রবিউল হক সাহেব প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও কায়েদের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের নির্দেশে ১৫/৬/১৯৯০ ইং তারিখে পার্শ্ববর্তী ৬টি মজলিসকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় কায়েদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। এই কায়েদ সম্মেলনটি পুরা ইজতেমায় রূপ নিয়েছিল। প্রতিটা মজলিস থেকে কায়েদ, মোতামাদ, নাযেম মাল, আতফাল ও শিশুরা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করায় অনুষ্ঠানটি অনেক সুন্দর হয়েছিল এবং সবার কাছে খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল। ঐ সময় জেলা কায়েদ মজিবুর রহমান সাহেব ও কুষ্টিয়া মজলিসের কায়েদ ফজলে ইলাহী সাহেব (বর্তমানে কেন্দ্রের ন্যাশনাল সেক্রেটারী) অংশগ্রহণ করেছিলেন। কায়েদ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী মজলিসগুলো হলো: চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, নাসেরাবাদ, উথলী, শৈলমারী, বটিয়াপাড়া। ন্যাশনাল কায়েদ ও বাংলাদেশ তবলীগ কমিটির সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী সাহেব ১/৬/১৯৯৪ তারিখের এক চিঠিতে জনাব রবিউল হক সাহেবকে চুয়াডাঙ্গার তবলীগ কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত করেন। যে জামা'তে প্রতিটা সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, শৃংখলাবোধ ও সম্প্রীতি, নেযামের এতায়াতের প্রতি সম্মান, সেই জামা'ত একটা সোনার জামা'তে পরিণত হবে। সেই জামা'ত দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করবে। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৪ পর্যন্ত বয়আত গ্রহণের একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :

চুয়াডাঙ্গা শহরে ৯ জন, বটিয়াপড়া গ্রামে ১৭ জন, শিয়ালমারি গ্রামে ১ জন, ঝিনাইদহে ২ জন, মোট ২৯ জন। বর্তমানে রবিউল হক সাহেব কেন্দ্রে দাতব্য চিকাৎসালয়ের চিকিৎসক, সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা ও কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সকল স্তরে কর্মরত নিষ্ঠাবান সেবকদের খেদমত কবুল করুন আর আহমদীয়াত ইসলামের বিজয়ের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখুন, আমীন।

ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ.) বলেছেন,

'বয়আতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, মুত্তাকীগণকে সংঘবদ্ধ করা অর্থাৎ তাকওয়াপরায়ণ ব্যক্তিদের একটি জামা'তে একত্রিত করা, যাতে এরূপ মুত্তাকীদের একটি ভারী সংঘ জগদ্বাসীর উপর স্বীয় নেক প্রভাব বিস্তার করতে পারে আর তাদের ঐক্যবদ্ধতা ইসলামের জন্য বরকত, সম্মান, গৌরব ও কল্যাণময় ফলোদয়ের কারণ হয় এবং পবিত্র কলেমায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে তারা ইসলামের পবিত্র সেবাকার্যে দ্রুত নিয়োজিত হতে পারে।'

(ইশতেহার, ৪/৩/১৮৮৯)

কবিতা-

খাঁটি মুসলমানের তালাশে

সিবগাতুর রহমান

দ্বীনের নবীর (সা.) পথে চলে, মানবতার কথা বলে,
ইসলামেরই ঝান্ডা তলে, খোদায় পূর্ণ ঈমান,
বলতে পার ও ভাই আমার! 'কোথা সে মুসলমান?'

নবীর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীতে, আমরা আছি শেষ যুগে।
আলেম কূলের ভ্রান্ত-পথে জ্বলছে মানব প্রাণ।
বলতে পার ও ভাই আমার! 'কোথা সে মুসলমান?'

তাদের কাছে নিরাপদ আর রইল না, নবীর (সা.) আমানত
হেফাজতের নামে তাদেরই হাতে জ্বলছে খোদার পাক কুরআন
বলতে পার ও ভাই আমার! 'কোথা সে মুসলমান?'

দেখতে কি পাও ভাইগো আমার সবই -পুড়ছে লেলিহান অগ্নি-শিখায়
বুড়ো, শিশু, বৃদ্ধ, নারী, উপসনালয় আর বসতবাড়ি
ব্যাকুল হৃদয় খুঁজে বেড়ায়, 'কোথা সে মুসলমান?'

ঈমান নিল চুরি করে ওরে নবীর (সা.) প্রেমিক জাগো,
এবার বুঝি এলোরে সময়, দিতে হবে জান।
বলতে পার ও ভাই আমার! 'কোথা সে মুসলমান?'

নবীজীর (সা.) সৌরভ নিয়া ইসলামের ঝান্ডা উড়াইয়া,
ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এই ধরাতে করছেন আহ্বান।
দেখতে যদি চাও, এসো ভাই! 'আমরা মুসলমান।'

শান্তির বাণী এমটিএতে, করছি প্রচার দিনেরাতে
আর্তমানবতার পাশে মোদের অবস্থান।
দেখতে যদি চাও, এসো ভাই! 'আমরা মুসলমান।'

যারা যেখানে যেমন বুলি, সেই ভাষাতে দিচ্ছি তুলি
সবার হাতে খোদার বাণী পবিত্র কুরআন।
দেখতে যদি চাও, এসো ভাই! 'আমরা মুসলমান।'

যুগ খলীফার আদেশ মতে, ইবাদতগাহ চলছি গড়ে
জগত জুড়ে করছি আমরা মসজিদ নির্মাণ।
দেখতে যদি চাও, এসো ভাই! 'আমরা মুসলমান।'

নওজোয়ান

সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

ওরে আহমদী বীর মুজাহিদ নওজোয়ানের দল,
আল্লাহ্‌র পথে ধন-প্রাণ যোগে অগ্রে তোরা চল।

ঈমানের আজ মহাপরীক্ষা শুরু হয়েছে ভাই,
মিথ্যার সাথে করতে হবে সত্যের লড়াই,
আসিছে আজ দাজ্জালিয়াত, চতুর্দিকে তোর,
তাইতো, মিথ্যা, জালিয়াতি-ব্যভিচারে দুনিয়া ভরপুর।

নানান ছলে নানান কলে নানান প্রলোভনে,
লুটছে ঈমান দাজ্জালরূপী কমবক্ত শয়তানে।

হরেক রকম ছলা-কলায় পাড়িয়েছে ঘুম,
লেগে গেছে শয়তানের আজ আনন্দেরই ধূম।

ধ্বংস করি দাজ্জালিয়াত ওরে মুজাহিদ,
আনতে হবে ধরার বুকে ইসলামেরই ঈদ।

পণ করেছ দীক্ষা-পত্রে নাই কি তোমার মনে,
ধন-দৌলত জীবন দিয়ে কায়েম রইবে দ্বীনে।

হেন সুযোগ কখনও তাই পাবে না কেউ আর,
অলসতার নয়রে সময় জলদি তোরা আয়।

মমিন কমিন পৃথক হবে ঈমানের পাল্লায়
অবিশ্বাসী কে-বা কারা, কে কারে বা কয়,
'আমলে ছালেহ' দিবে তার সত্য পরিচয়।

ঈমানের জোশ বক্ষে বয়ে দ্রুত চল আজ,
পিছে এসে কেহ যেন না দেয় তোমায় লাজ
বাধা-বিপদ আসুক যত সম্মুখে তোমার,
ঈমানেরই তপ্ত তেজে পাহাড় হবে চুড়।

রেখে গেছে স্বাক্ষর হেরা, আরব মরুর তটে,
তাই তো আজি তাঁদের পদে বাজার মুকুট লুটে।
তাঁদের পদ-চিহ্ন ধরে দ্রুত চল বীর,
সেদিন দূরে নয়, সে তোমার পদতলে করবে ভীড়।

কলি যুগের কথা

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

নয়ন মেলে দেখ সবে
বদলে গেছে সব
সত্য ভুলে করছে সবে
মিথ্যার কলরব।
ন্যায়-ধর্ম মানবতা
শুধুই মিছে বুলি
ঈমান, আমল তুচ্ছ অতি
শিকেয় রেখেছে তুলি।
স্বার্থের তরে অন্ধ সবাই
নেই কোন হিতাহিত
থরথরিয়ে কাঁপছে দেখ
সভ্যতার ভীত।
মানুষ কেমন বদলে গেছে
পশুর আদলে,
হিংস্রতাই বাড়ছে শুধু
প্রেমের বদলে।
সমাজ সংসার খাচ্ছে কুঁড়ে
কুসংস্কারের ঘুণ,
পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কেবল
মিথ্যা, ধ্বংস, খুন।
কুরআন হাদীস ব্যবসার পুঁজি
হারিয়েছে তার শিক্ষা,
মুসলিম তাই দলে দলে
সন্ত্রাসে নেয় দীক্ষা।
মানুষ মরছে দেশে দেশে
সম্পদ নিচ্ছে লুটেপুটে
শান্তির বাণী হচ্ছে ব্যর্থ
মরছে মাথা কুটে।
গদ্দীনশীন পীর সাহেবান
আছেন স্বর্গ-সুখে,
ধর্ম তাদের রঙ্গীন-পোশাক
অদ্ভুত বুলি মুখে।
ইসলাম রবি যাচ্ছে ডুবে
নেই তাদের ভ্রুক্ষেপ,
একেই বলে কলির যুগ
নবীজীর (সা.) আক্ষেপ।
ঈমান গেছে সপ্তর্ষী মন্ডলে,
মুসলিম বাহাত্তর উপদলে।
মুসলিম জাহান কান্ডারীহীন
কে ধরবে তার হাল,
নবীজীর (সা.) বাণী শোন কান পেতে
আসবে শুভ সকাল,
এসেছেন ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
মির্যা গোলাম আহমদ নাম,
ধর তারই খলীফার হাত,
পাবে মুক্তির সন্ধান।

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

কান পেতে শুন যারা আজ শুননি
ইমাম মাহ্‌দী এসে গেছেন ভবে
পূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহ্ ও রসূলের বাণী।

বনী ইসরাঈলী ঈসার (আ.) মৃত্যু
পবিত্র কুরআনের ত্রিশ আয়াতে প্রমাণ।
বসে আছেন তিনি চতুর্থ আকাশে
তা মানব প্রসূত অনুমান।

যে ঈসার (আ.) আসার কথা ছিল
তিনি নবী উল্লাহ্ বটে।
ইবনে মরিয়ম নিশ্চয় তিনি
তবে ইসরাঈলী নহেন জাতে।

মোহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হতে তিনি
ঈসা মরিয়ম নামধারী।
খাতামান নাবীঈন এর খাতামের সম্মানে
তাঁর উম্মত হতে তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী।

বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দেওয়ার
এখানে সুযোগ নেই।
সূরা আল কাওসারের ঘোষণা
তাদের লেজ কাটা তাই।

যিনি আসবেন, আসিবেন তোমাদের মধ্য হতে।
কুরআনে দেখ লেখা আছে কিনা
সূরা আল জুমুআতে।

গাল গল্প মিথ্যা বানোয়াটে যতই মজাবে মন।
তোমরা ততই বঞ্চিত রবে আর খুশী হবে দুশমন।

দাজ্জালের সাথে করিতে যুদ্ধ
যোগ দাও মাহ্‌দীর দলে।
ইসলামের বাগান জীবন্ত হয়ে
ভরে উঠুক ফুলে ফলে।

খাতামান নাবীঈনের পরে
আর কোন নবী নাই।
মাহাত্ম তাহার অনুধাবন করে।
ধন্য হও ভাই।

প্রকাশিত হয়েছে

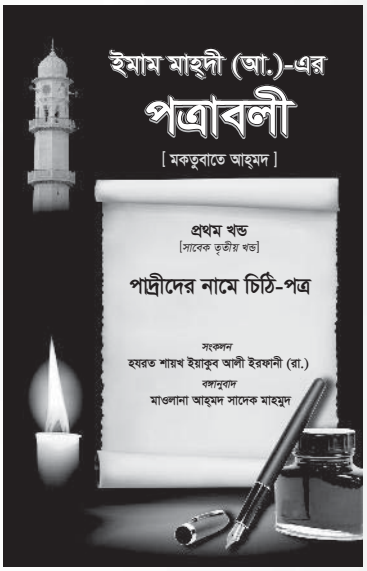

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

প্রবাসী আহমদীদের কথা-

দক্ষিণ কোরিয়া'র ১৮তম সালানা জলসায় আমরা ক'জন বাঙ্গালী

জলসার একফাকে তোলা দু'টি ছবি

কোরিয়া অবস্থিত সদর সাহেবের সাথে ক'জন বাংলাদেশী

সদর সাহেবের সাথে লেখক

গত অক্টোবর/২০১৩ মাসের শেষ সপ্তাহে শেষ হলো দু'দিন ব্যাপি ১৮তম সালানা জলসা উত্তর কোরিয়াতে। খুব জাঁকজমক পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত এ জলসা উপভোগ করেছি আমরা। এ মহতি জলসায় আমরা ৭ জন বাংলাদেশী উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করি, আলহামদুলিল্লাহ। তাছাড়া পাকিস্তান, ভারত ও অন্যান্য দেশের জামা'তি ভাইয়েরা উক্ত জলসায় যোগদান করেন।

এখানে এসে এ ধরনের জামা'তি কার্যকলাপে অংশ নিতে পারবো তা আমরা ভাবতেও পারিনি। প্রায়ই বাংলাদেশের খোদ্দামুল আহমদীয়া'র সদর সাহেবের স্বরণাপন্ন হয়েছি, কোরিয়ায় জামা'তের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। খোদার অসীম রহমতে কোরিয়ায় জামা'তের সন্ধান পেয়েও যাই। আমরা এখান থেকে প্রায় ৫০০শত কি:মি: দূরে Anseong, Gyeonggi-do, South Korea থাকি। এতদূর থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়া জামা'তের যে কোন অনুষ্ঠানসহ মাঝে মাঝে শুক্রবারের জুমুআর নামায আদায় করতে সেখানে যাই। আহমদী ভাইদের সাথে নামায ও জামা'তি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমাদের কী যে ভাল লাগে, তা আসলে বোঝানোর মত নয়।

কোরিয়া জামা'তের পরিবেশ খুবই ভাল। কোন ধরনের মোখালেফাত বা মৌলবাদী ঝামেলা নেই। সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি, যাতে প্রবাসে আহমদীয়া জামা'তের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতে পারি এবং জামা'তের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারি।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সুমন
সিউল, দক্ষিণ কুরিয়া।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৯০তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে 'পাক্ষিক আহমদী'র সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ

-সম্পাদক

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো
পাঠক কলামের এই অংশ]

প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই কোন মানুষই একা বসবাস করতে পারে না। আপনজনদের সঙ্গে বসবাস করা সত্বেও সকলেই প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অর্থাৎ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত সকল ধর্মেই প্রতিবেশী সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম এই 'প্রতিবেশী' সম্পর্কটিকে খুবই মর্যাদা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রতিবেশী সম্পর্কে একাধিকবার বলা আছে। বলা হয়েছে “এবং সদয় ব্যবহার করো আত্মীয়-প্রতিবেশী ও অনাত্মীয়-প্রতিবেশীর সাথে” (৪:৩৭) আমাদের প্রিয় রাসূল মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করে আমাকে প্রতিবেশীর বিষয়ে অবিরত উপদেশ দিতে লাগলেন। এমন কি আমার ধারণা হলো, হয়ত তিনি “প্রতিবেশীকে ওয়ারীশে” পরিণত করবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আয়েশা (রা.) আঁ হযরত (সা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। এর মধ্যে কাকে আমি উপহার দেব? উত্তরে তিনি বললেন, উভয় প্রতিবেশীর মধ্যে যার গৃহের দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী (বুখারী)। আবার বুখারী, মুসলিম ও মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন “আল্লাহ্‌র শপথ! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়! সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, যার দুষ্কর্মের হাত হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।”

বিপদ হলে আত্মীয়-স্বজন খবর পাওয়ার আগেই কিন্তু প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে। সহযোগিতার হাত যেমন তারা বাড়িয়ে দেয়, তেমনি অপর প্রতিবেশীরও উচিৎ হবে তারও হাত প্রসারিত করা। এটি ইসলামী-শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পয়গামে সুলেহ পুস্তকে বলেছেন, “আর যদি কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি হতে বঞ্চিত করে, তবে তার ক্ষতি তাকেও ভোগ করতে হবে। এক প্রতিবেশীর কথা অপর প্রতিবেশীর কাছে বলা উচিৎ নয়। কোন প্রকারেই প্রতিবেশীর গৃহভ্যন্তরে উঁকি মারা বা কান লাগিয়ে ওৎ পেতে তাদের কথাবার্তা শোনা যাবে না। শব্দ-দুষণ করেও কোন ভাবেই প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া যাবে না। উত্তমভাবে সাক্ষাৎ করা আর নম্রভাবে কথা বলাও একটি সদকা।

কারণ আল্লাহ্ তা'লা নম্র এবং এজন্য নম্রতাকে তিনি পছন্দ করেন। অতএব প্রতিবেশীদের সঙ্গে নম্র আচরণ করাও ইসলামী শিক্ষার আওতাভুক্ত।

জনৈক ব্যক্তি হজ্জে যাবার জন্য জুতা সেলাই করে দীর্ঘদিন ধরে অর্থ জমিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীর বিপদের দিনে সমুদয় অর্থ তাকে দিয়ে দিলেন একথা ভেবে যে, জীবনে যদি বেঁচে থাকেন আবারো অর্থ জমাবেন। অন্তর্জামি মহান আল্লাহ্ এই ব্যক্তির হজ্জ কবুল করলেন, সৎ-নিয়তের পুরস্কার দিলেন। এই ঘটনাটি প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কেবলমাত্র নিজেদের বিপদের সময়ে সাহায্য করেই নয়, গাছ-গাছালীর ফল-সব্জী এমনকি রান্না করা তরকারী প্রতিবেশীকে দিলে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। মহানবী (সা.) বলেছেন “হে আবু যার! যখন তুমি তরকারি রান্না করবে, তখন তাতে একটু বেশী পানি দাও এবং তোমার পড়শীর খোঁজ খবর নাও এবং প্রথানুযায়ী কিছু পাঠিয়ে দাও।” “হে মুসলিম নারীগণ! কোন প্রতিবেশীনি যেন তার প্রতিবেশীনিকে তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর হাদিয়া প্রেরণ করে হলেও।” (বুখারী ও মুসলিম)

পড়শির মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম-পড়শি সেই ব্যক্তি, যে তার পড়শির জন্য উত্তম। নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিবেশীর মধ্যেও শেয়ার করার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা নিহিত, আলহামদুলিল্লাহ্।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করলে চমৎকার ইসলামী সমাজ-প্রতিষ্ঠিত হবে

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম-আচরণের ওপর ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৩৭নং আয়াতে বলেন, 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, এবং সদয় ব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয় স্বজন এবং এতীম এবং মিসকিন এবং আত্মীয়-প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয়-প্রতিবেশীগণের সাথে এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সাথে এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে, তাদের সাথে। আল্লাহ্ তাদেরকে আদৌ ভালবাসেন না, যারা অহংকারী দাম্ভিক।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, তোমরা নিজেদের ভাই, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের সাথে সহযোগিতা করবে, প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে, যতদূর সম্ভব তাদের কল্যাণ পৌঁছাবে এবং এমন সব লোক, এমন প্রতিবেশী, যাদেরকে তুমি জান না। কেননা তাদের সাথে তোমার কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাত হয়েছে, তাদেরও যদি কোন প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সাহায্য করতে হবে।

আমরা যদি কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করি, তাহলে একটি চমৎকার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবে না, বৌ-শাশুড়ীর ঝগড়া হবে না, ভাই ভাইয়ের ঝগড়া হবে না। পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া হবে না। সকলে একে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে বসবাস করবে। একে অন্যের উপকার করার চেষ্টা করবে, প্রত্যেকের অধিকার প্রত্যেকে আদায় করতে চেষ্টা করবে।

ইসলামে যে সকল অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে অধিক মাত্রায় তাগিদ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য তাগিদ করেছেন আর এ ব্যাপারে হাদিসেও ব্যপক আলোচিত হয়েছে। প্রতিবেশী বলতে সাধারণত পাশাপাশি বসবাসকারীদেরকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী-শরীয়তের পরিভাষায় কেবল পাশাপাশি বসবাসকারীই প্রতিবেশী হিসাবে বিবেচিত নয় বরং হাদীস শরিফে মহানবী (সা.) আশেপাশের ৪০ ঘর-বাড়ী পর্যন্ত প্রতিবেশী বলে আখ্যায়িত করেছেন। উপরোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম জোহরী বলেন, নিজ ঘরের সামনের দিকে ৪০ ঘর, পেছনে ও ডান দিকে ৪০ ঘর, বামদিকে ৪০ ঘর প্রতিবেশী বলে বিবেচিত।

ইসলামের অসংখ্য অনুশাসন মেনে চলা সত্ত্বেও কোন লোক মু'মিনের কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যদি সে প্রতিবেশীদের সাথে সদাচারী না হয়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, কোন মু'মিন কিছুতেই তার প্রতিবেশীর অনিষ্ঠ সাধন করতে পারে না। এ শিক্ষা উপেক্ষা করে কারো পক্ষে পূর্ণ মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত প্রতিবেশীর অনিষ্ঠ সাধনকারী ব্যক্তিকে ইসলাম মু'মিন বলে স্বীকৃতি দিতেই প্রস্তুত নয়।

সুপ্রতিবেশীর কর্তব্য হচ্ছে প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা। এক প্রতিবেশী দ্বারা অন্য প্রতিবেশীর যাতে কোন ধরণের ক্ষতি না হয়, তা সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধে প্রতিবেশীর অধিকার এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত যে দৈনন্দিন জীবনের সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়ার শিক্ষা ইসলামে রয়েছে।

প্রতিবেশী যে কেউ হোক, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই প্রতিবেশী, আর সবাই সমান-মর্যাদা পাবে এবং মানবিক ব্যবহারের বিনিময়ে সবার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে হবে।

প্রতিবেশীর কোন বিপদ-আপদ আসলে তাকে সহানুভূতি ও প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার প্রয়োজনীয় সেবাযত্ন করা সুন্নত। পক্ষান্তরে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, তার প্রতি অত্যাচার করা গুনাহের কাজ। কারণ প্রতিবেশীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে গেলে গোটা সমাজেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে। অত্যাচারী প্রতিবেশী পরকালে জান্নাত প্রাপ্তির অধিকার হারিয়ে ফেলে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : যার প্রতিবেশী তার অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা পায় না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

আমাদের উচিত, আমাদের পার্শ্ববর্তী মানুষের সাথে সব সময় ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের সাথে সুখে-দু:খে সাড়া দেয়া। অন্তত এমন আচরণ যেন আমরা না করি, যা অন্যের মন:কষ্টের কারণ হয় এবং প্রতিবেশী ও সমাজের ক্ষতি করে।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাকা

"যে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়, সে আমার দলভুক্ত নয়"

কোন ব্যক্তি যখন কোন বিপদে পড়ে, তখন তার পরিবারের লোকদের কথা মনে পড়ার পর আর যাদের কথা মাথায় আসে, তারা হলেন প্রতিবেশী। হ্যাঁ, প্রতিবেশীরাই আমাদের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সবার আগে ছুটে আসেন। তাই ইসলাম যা পরিপূর্ণ ধর্ম ব্যবস্থা, তাতে প্রতিবেশীর অধিকারকে সু-প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

প্রতিবেশী আত্মীয় বা অনাত্মীয় যাই হোক না কেন, আমাদেরকে তাদের হক আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন–"এবং সদয় ব্যবহার কর.....আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে....." [৪:৩৭]।

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে প্রতিবেশী আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী, তাদের সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়। বরঞ্চ,

সদ্ব্যবহার ও নম্রতার সাথে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। প্রতিবেশীর হক আদায়কে ইসলামে এতই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের সময় হজ্জ পালনকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই তার আশে পাশের ৪০টি ঘরের খবরাখবর নিতে হয় এবং প্রয়োজনে তাদেরকে সাহায্য করতে হয়।

একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল পাক (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, 'সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিনি এ কথাটি অনেক উচ্চ-স্বরে বলছিলেন)। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না?' তিনি বললেন, 'সেই ব্যক্তি, যার দুস্কর্মের হাত হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' আরেকবার হযরত আয়েশা (রা.) যখন তরকারি রান্না করছিলেন তখন মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন, 'হে আয়েশা! তুমি যখন কিছু রান্না কর তখন একটু বেশী করে রান্না কর। আর যদি তা না পার, তবে ঝোলের পরিমাণ বাড়াও, যাতে আশপাশের লোকদেরকেও কিছু দিতে পারো।'

এই হল প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাদের মহানবীর শিক্ষা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রতিবেশীদের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।" [কিশতিয়ে নূহ্]

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

বুশরা মজিদ, চট্টগ্রাম

আমাদের আচরণে প্রতিবেশী মুগ্ধ হবে

আমাদের চার পাশে যে সব অন্য পরিবার বাস করে তাদেরকে প্রতিবেশী বলে থাকি। সেই প্রতিবেশী ধনী, গরীব, হিন্দু, বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের হতে পারে। প্রতিবেশী যেই হোক না কেন, আমাদের সবাইকে প্রতিবেশীর হক আদায় করা উচিত।

প্রতিবেশীর বিভিন্ন সুবিধা ও সমস্যার সময় খোঁজ নেওয়া, তাদের অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীরা খাবার খেয়েছে কি-না, তার খোঁজ করা। আর এই ভাবেই প্রতিবেশীর হক আদায় করতে হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, বেশীর ভাগ মানুষ নিজের পরিবারকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নিজের পরিবারের ভাল খাবার, কাপড় ও অন্যান্য বিষয়ে খেয়াল রাখে। কিন্তু তার প্রতিবেশী যে না খেয়ে আছে, শীতের কাপড় নাই, আরো অন্যান্য সমস্যায় ভুগছে, তার কোন খেয়াল রাখি না। এটাই কি আমাদের প্রতিবেশীর হক আদায়? আমরা যেমন আত্মীয় প্রতিবেশীর খোঁজ খবর রাখি ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, তেমনি অনাত্মীয় প্রতিবেশীদেরও খোঁজ খবর রাখা উচিত ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত।

আমরা যদি প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, তাদের সুখে-দুঃখে এগিয়ে যাই, তাহলে তারাও আমাদের সুখে দুঃখে এগিয়ে আসবে। কারো কাছ থেকে ভালো কিছু পেতে হলে, তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। এই বিষয়টি সকল মানুষের মনে রাখতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে। তাই আমাদের সকলের অবশ্য-কর্তব্য প্রতিবেশীদের সাথে সদয় ব্যবহার করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, সামান্য কোন বিষয়ে আমরা ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়ছি, এমনকি পরস্পর লাঠিসোটা নিয়ে মৃত্যু-যুদ্ধে নিপতিত হচ্ছি। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কি আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন? আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা মত না চলে নিজেদের খেয়াল মতো চলছি। যার ফলে বর্তমান সমাজে প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর মারমুখী যুদ্ধ লেগেই আছে। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রাসূল (সা.) কেবল মুসলমান প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলেন নি, বরং বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের লোকদের সাথেও ভাল ব্যবহার করতে বলেছেন। মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত, অর্থাৎ সৃষ্টি সেরা জীব। তাই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আমাদের সকল মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় সর্বোত্তম জীবন অতিবাহিত করতে হবে। কারণ মানুষের প্রয়োজনেই মানুষ।

আমরা যদি প্রতিবেশীর সামান্য কিছু বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে না পারি, তাহলে আমরা কিসের মু'মিন মুসলমান। রাসূল করীম (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিবেশীর জন্য আমাদেরকে সামান্য হলেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন বিধর্মীর বাড়ি থেকে কিছু দিলে, তা মহিলারা রাখে না, অর্থাৎ তাদের দেওয়া উপহার ফেরত দিয়ে দেয়, এ সম্পর্কে রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশী নারী যেন তার অপর প্রতিবেশী নারীকে তার পাঠানো উপহার ফেরত দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন না করে, যদিও তা বকরীরর পায়ের ক্ষুরা হোক না কেন। এই হাদীসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের প্রতিবেশী যে পন্যই দিক না কেন, তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরণের মজাদার খাবার রান্না করে থাকি। কিন্তু প্রতিবেশীকে এই মজাদার খাবার থেকে বঞ্চিত রাখি।

হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখা প্রসঙ্গে বলেন, হে আবু হুরায়রা! যখন তুমি তরকারি পাকাও, তাতে একটু পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও, অত:পর নিজের প্রতিবেশীর ঘরের খোঁজ-খবর নাও এবং তাদেরকে এই ঝোল থেকে ভালভাবে দাও। বর্তমান সময়ে এমন কতজন মহিলা আছে, যারা এই হাদীসের ওপর আমল করে? তাই, আহমদী মহিলার উচিৎ হবে প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর রাখা।

আমরা বিভিন্নভাবে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে থাকি। কিন্তু রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। বর্তমান সমাজে আমরা অনেক প্রতিবেশী নিয়ে বসবাস করে থাকি। কোন্ প্রতিবেশীকে প্রথমে প্রাধান্য দেব, সে বিষয়ে রাসূল পাক (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে প্রতিবেশীর ঘর বা দরজা নিকটবর্তী, তার কাছে প্রথমে উপহার

পাঠাবো। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়। তিনি আরো বলেন, আর যদি কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি হতে বঞ্চিত করে, তবে তার ক্ষতি তাকেও ভোগ করতে হবে।

তাই আহমদী হিসেবে আমাদের উচিত, প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করা, তাদের খোঁজ-খবর রাখা। বিপদ-আপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো। আর আমাদের প্রতিবেশীই যাতে আমাদের ব্যাপারে এই কথা বলে যে, তারা প্রতিবেশী হিসেবে অন্য সকল প্রতিবেশী থেকে অনেক ভাল। তারা আমাদের বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর নেয়। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রতিবেশীর হক আদায় করার তৌফিক দিন, আমীন।

আহমদ উজ্জ্বল, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ইসলাম প্রতিবেশীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে

সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক-সম্পর্ক তো বটেই, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা একমাত্র মুসলমানই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর ভাবে ব্যক্ত করেছে। ইসলামী শিক্ষা এমনই এক ভান্ডার, যেখানে প্রয়োজনে সব রসদই পরিপূর্ণরূপে মজুদ পাওয়া যায়। ইসলামী শিক্ষা ক্ষুদ্র হতে বৃহত্তর পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত। বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে আজ একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের মহা উৎকর্ষের যুগেও দুঃখের সাথেই বলতে হয়, পরম শ্রদ্ধেয় মহান বিজ্ঞানীরাও ইসলামী শিক্ষার সে মহাবিজ্ঞানকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। যে শিক্ষা নিজেকে পরম ও চরম বলে দাবী করে, তাকে ব্যাপক উৎসাহের সাথে তলিয়ে দেখা বিশ্ববাসীর উচিত ছিল।

"যার প্রতিবেশী তার অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা পায় না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

পবিত্র কুরআন বলে অনুতাপ তাদের জন্য যারা লোক দেখানো নামায পড়ে। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার কথা বলে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করে না। যারা প্রতিবেশীর প্রতি সদয় নয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে তাদের সাহায্য করে না। প্রতি শুক্রবারে যে খুতবা দেওয়া হয়, তাতে বর্ণনা করা হয়–নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ দেন ন্যায় বিচার এবং অনুগ্রহ করার জন্য এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য। এ যুগের সংস্কারক যুগ ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, যে তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিদ্রা যায়, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।

তিনি আরো বলেন, যদি কোন হিন্দু বৌদ্ধ বা খৃষ্টানের ঘরে আগুন লাগে, আর সে তা নিভাতে না যায়, তবে সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে যাওয়া, প্রতিবেশীর বিপদে আপদে সাহায্য করা, দাফন কাফনে যথাসাধ্য সাহায্য করা, ইসলামী শিক্ষার অঙ্গ। পাড়া প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা শুধু ইসলামী সংস্কৃতিই নয়, এটা ইসলাম ধর্ম। ইসলামের অপর নাম শান্তি। পাড়া প্রতিবেশীর শান্তি প্রতিষ্ঠা না করে বিশ্ববাসীর শান্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? ইসলামের শিক্ষা পাড়া প্রতিবেশীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমরা ইসলামের অনুসারী হয়ে যেন ইসলামী শিক্ষার অবমাননা না করি।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

তেজগাঁও- জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ৩১ জানুয়ারী, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমুআ স্থানীয় জামে মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলাম'-এ মজলিস আনসারুল্লাহ, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর সার্বিক সহযোগীতায় অনুষ্ঠিত হয় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ-এর সভাপতিত্বে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম। সুললিত কণ্ঠে উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। বক্তৃতা পর্বে 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলবী মাহমুদ আহমদ সুমন, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। এরপর 'পারিবারিক জীবনে মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, মুরুব্বী সিলসিলাহ, বাংলাদেশ। 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আলহাজ্জ কায়সার আলম, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেজগাঁও। এরপর 'মানবতা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মাকসুদউল হক, যয়ীমে আলা, তেজগাঁও।

শেষে সভাপতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় সকলকে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার প্রতি আহ্বান জানান এবং যুগ-খলীফার খুতবা এমটিএ-তে দেখার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত জলসায় ১০জন মেহমানসহ প্রায় শতাধিক আহমদী সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মাকসুদউল হক

চট্টগ্রাম জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১১-১০-২০১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্যোগে পতেঙ্গা হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুজাহিদ আলম এবং নযম পেশ করেন জনাব আব্দুল মান্নান। 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস' এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব জিয়া উদ্দিন জিয়া। এরপর 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী'র ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মাওলানা জাফর আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা এবং সাহাবউদ্দিন সিহাব, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব জহির উদ্দিন আহমদ, হালাকা প্রেসিডেন্ট, পতেঙ্গা

হালকা। পরিশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এই মহতী অনুষ্ঠানে ৮ জন আনসার, ২০ জন খোদ্দাম, ৪ জন আতফাল, ১৫ জন লাজনা, ১০ জন নাসেরাত এবং ৩ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া,
চট্টগ্রাম

উথলীতে বাংলাদেশে আহমদীয়া শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ উদ্বোধন ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

আজ থেকে ৭৬ বছর পূর্বে ১৯৩৮ সালে তৎকালীন ভারতের কুষ্টিয়ার জীবননগর-এর উথলী নামক গ্রামে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সংবাদ পেয়ে বয়আত গ্রহণ করেন ডা: আমীর হোসেন বিশ্বাস। বর্তমানে যা চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানাধীন উথলী নামে পরিচিত।

ষাটের দশকে যখন সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন তখন তাঁর পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল উথলীর এই উর্বর মাটি। সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ উথলীকে কাদিয়ানের সাথে তুলনা দিয়ে জোর গলায় উচ্চারণ করেছিলেন "ম্যারা মালুম হোতা হে ইয়ে কাদিয়ান" অর্থাৎ আমার মনে হচ্ছে এটি কাদিয়ান। সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদের এই উক্তির রহমত, বরকত ও ফলাফল আজও উথলী বাসী স্মরণ করে। যখন সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ উথলী আসেন তখন তিনি পাকা মসজিদের ভিত্তি রাখেন। সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ তখনও খলীফা হননি। খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও জানা যায় হুযূর (রাহে.) উথলীকে মনে রেখেছিলেন। তারই প্রমাণস্বরূপ হুযূর (রাহে.) উক্ত মসজিদের নাম দেন- 'বায়তুস সোবহান'।

ষাটের দশকে নির্মিত মসজিদটি যখন আর জায়গা সংকুলান হচ্ছিল না তখন ২৫ মে ২০১৩ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্বের উর রহমান সাহেব নতুন মসজিদের ভিত্তি রাখেন। তখন উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ, লাজনা ইমাইল্লাহর সদর মিসেস রওশন জাহান, সদর আনসারুল্লাহ্‌, সদর খোদ্দামের প্রতিনিধিবৃন্দ, অত্র অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট, মুরব্বী, মোয়াল্লেম সাহেবান ও স্থানীয় সদস্যগণ। এরপর মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২৩ অক্টোবর ২০১৩ থেকে। এই মসজিদের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেন আমেরিকা নিবাসী বাঙ্গালী আহমদী মোকাররম আব্দুল গাফ্‌ফার সাহেব। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁকে পুরস্কৃত করুন, আমীন। এই মসজিদের কাজের অগ্রগতি নিয়ে সার্বিক তদারকিতে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ্‌ সাহেব ও মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। তাঁদের সার্বক্ষণিক তদারকিতে আল্লাহ্‌র ফযলে কাজ দ্রুত শেষ হতে থাকে। স্থানীয় ভাবে একটি কমিটি গঠিত হয় যারা মসজিদ নির্মাণে ভূমিকা রাখেন। এদের মধ্যে সর্বজনাব, আবুল হায়াত বিশ্বাস, আব্দুল কাদের শিল্টু, মহিউদ্দিন আহমদ রিপন, শাহীনূর রহমান, আব্দুল মান্নান পিল্টু। এছাড়া স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ: মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের সকলকে পুরুস্কৃত করুন, আমীন। স্থানীয় কিছু অ-আহমদী ভাইয়েরাও মসজিদের কাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। এছাড়া এই জামা'তের বুযূর্গ ও সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সন্তোষপুর জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল গফুর মাষ্টার সাহেব বিভিন্ন সময়ে বয়সের ভার উপেক্ষা করেও মসজিদের নির্মাণ কাজ দেখতে এসেছেন। জামা'তের বুযূর্গ সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা: শামুসুল হক মিয়া অসুস্থ অবস্থায়ও মসজিদ নির্মাণ দেখতে এসেছেন ও দোয়া করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা এই নেকচেতা ব্যক্তিদের দীর্ঘায়ু দান করুন, আমীন।

মাত্র তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর ও দর্শনীয় মসজিদের কাজ শেষ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উল্লেখ্য যে, সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদের ভিত্তি রাখা বায়তুল সোবহানের ইট স্থানান্তর করা হয় নবনির্মিত মসজিদের মেহরাবের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে। এই মসজিদটিতে একটি বড় গম্বুজ ও ৪টি মিনার রয়েছে। এই মসজিদ অত্র এলাকার দর্শনীয় মসজিদে পরিণত হয়েছে।

গত ১৪ই জানুয়ারী ২০১৪, ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে সীরাতুন নবী (সা.) জলসারও আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ করে অ-আহমদী মেহমানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। দুপুর ১২ টায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসা শুরু হয়। মহানবী (সা.) এর সীরাত নিয়ে নযম পাঠ করেন স্থানীয় মজলিসের যয়ীম আলা জনাব শাহীনূর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাহাব উদ্দিন আহমদ, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, জনাব আবুল খায়ের, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪, এবং জনাব মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী। জলসার শুরুতেই "বাঙ্গলী মননে অসম্প্রদায়িক চেতনা ও আহমদীয়াত" নিয়ে বক্তৃতা দেন মৌলবী মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু। এরপর মহানবী (সা.) এর জীবন ও তাঁর নামায নিয়ে বক্তৃতা দেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল

খান চৌধুরী। অত:পর অত্র অঞ্চলের অ-আহমদী রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিকগণ পর্যায়ক্রমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জীবননগর থানা প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব আনওয়ারুল কবির। উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী। উথলী কলেজের প্রফেসর জনাব রায়হান আলী প্রমুখ সম্মানিত ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্যে আহমদীয়া জামা'তের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। এছাড়া দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আজকাল, দৈনিক জনকণ্ঠের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কিছু স্থানীয় পত্রিকায় শতবর্ষ মসজিদ ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসার ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হয়। অবশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব নবনির্মিত মসজিদে জোহর ও আসর নামায আদায় করেন। নামায শেষে দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। এতে অ-আহমদী (পুরুষ ও মহিলা) ১১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যায় সাহিত্য বিষয়ক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মেহমান জনাব মোশাররফ হোসেন। বর্তমান যুগ খলীফার ছায়াতলে থেকে তাঁর দেয়া আধ্যাত্মিক ওষুধ থেকে যেন আমরা আরোগ্য লাভ করি ও বেশী বেশী মসজিদমুখী হই তাঁর জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করছি, আমীন।

মোয়ায্‌যেম আহমদ সানী

চাঁদপুর চা-বাগানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৪/০১/২০১৪ চন্ডিছড়া চা বাগানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। জলসার কর্মসূচী হিসেবে সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ওকারে আমল করা হয়। এরপর বিকাল ৩টা থেকে ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান পাপন, নযম পাঠ করেন, ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী। মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মোশারফ হোসেন সুমন, ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং মৌলবি হুমায়ুন কবীর। পর্দার অন্তরাল থেকে লাজনাইমাইল্লার সদস্যরাও বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সভাপতি ভাষণ প্রদান করেন। এরপর উপস্থিত ৮ জন জেরে তবলীগণের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের পর দোয়ার মাধ্যমে জলসা সামপ্তি করা হয়।

প্রেসিডেন্ট, চাঁদপুর চা বাগান

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ক্রোড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০১/২০১৪ রোজ শনিবার বেলা ৩ ঘটিকায় মরহুম সাব্দের মাহমুদ ভূইয়ার বাড়িতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ক্রোড়ার উদ্যোগে নার্গিস আক্তার, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, ক্রোড়া'র সভানেত্রীত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সাবেরা বেগম। নযম পাঠ করেন নাদিরা বেগম। তারপর মুহাম্মদ (সা.) জন্ম এবং প্রাথমিক-জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন শামসুন্নাহার কল্পনা। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর ওপর অত্যাচার এবং ইসলামের বাণী প্রচার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শেফালী বেগম। সভানেত্রী সীরাতুন নবী (সা.) জলসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগ ৪ জনসহ মোট ৬৩ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নার্গিস আক্তার

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ খুলনায় তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ খুলনার উদ্যোগে গত ১৭/১২/২০১৩ রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার আমীর সাহেবের বাসায় এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, খুলনা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ, হাদীস পাঠ করে শোনান রোজীনা শহীদ। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। বয়আতের শর্ত পড়ে শুনান শাহনাজ শিরিন। নযম পাঠ করেন আয়শা কোমল সেতু।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জহুরা তাজনীন, জনিয়া আশা ও সভানেত্রী। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত সেমিনারে ১৮ জন মেহমানসহ মোট ৪২ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

রোকশানা মঞ্জুর ডলি

বিজয় দিবস উপলক্ষে গাজীপুর জামা'তে তালিম তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৩ সকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গাজীপুর-এ বিজয় দিবস উপলক্ষে সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অত:পর একটি তালিম-তরবিয়তী সেমিনার স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অত:পর বক্তৃতা পর্বে সর্বজনাব আনোয়ার আশরাফ বক্তব্য রাখেন 'তাক্ওয়া হচ্ছে শরীয়তের মগজ এবং দোয়া কবুলিয়তের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত' বিষয়ে। 'প্রত্যেক আহমদীর উচিত বিনয় ও নম্রতার গুণাবলী সৃষ্টি করা এবং ধর্মীয় সেবার জন্য নিজের মাঝে এক ধরণের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করা' এ বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কবীর আহমদ। 'মালী কুরবানী' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন শেখ মাহমুদ।

'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ইকবাল হোসেন। 'ক্রোধ থেকে বাঁচা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা উচিত' এ বিষয়ে আলোচনা করেন মৌ. লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেলাল আহমদ

চট্টগ্রামে বিশেষ তরবিয়তী কার্যক্রমের মাধ্যমে ইংরেজী নতুন বছরকে বরণ

গত ০১-০১-২০১৪ তরিখ রোজ বুধবার দিবাগত রাতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে ১২.০১ মিনিটে নফল নামায এবং পরবর্তীতে তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা চকবাজারস্থ মসজিদ বায়তুল বাসেতে করা হয়। নফল নামাযে ৩২ জন খোদ্দাম, ৮ জন আনসার, ২ জন আতফাল এবং ৮ জন লাজনা অংশগ্রহণ করেন এবং বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযে ১৮ জন খোদ্দাম, ২ জন আনসার, ২ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজন পতেঙ্গা হালকায় করা হয়, সেখানে ১০ জন খোদ্দাম ১ জন আনসার অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বেশ কিছু সদস্য নফল নামায নিজ বাসস্থানে আদায় করেছেন।

নফল নামাযের পূর্বে রাত ১১.৩০ মিনিটে এবং পরবর্তীতে নফল নামাযের পর জামা'তের ইতিহাস এবং অন্যান্য মাসলা-মাসায়েল নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আরিফ উজ জামান, সেক্রেটারী উমুরে খারিজা-আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম, মাওলানা জাফর আহমদ, এবং কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম।

কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম

তেজগাঁও জামা'তে সপ্তাহ ব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তেজগাঁও জামা'তের হালকা তেজতুরী বাজারে লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবার বাসায় আতফাল ও নাসেরাতদের নিয়ে সপ্তাহব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এতে তেজতুরী বাজার হালকার সকল আতফাল ও নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ক্লাসে সহি কুরআন পাঠ, অর্থসহ নামায শিক্ষাসহ ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষা প্রদান করেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেয়া হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

নূরনগর-এ তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

নূরনগর ঈশ্বরদী'র উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে গত ২১ ডিসেম্বর হতে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আতফাল ও নাসেরাতদের তালীম-তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। ক্লাস শেষে বিভিন্ন পরীক্ষা ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় আর এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহি)। এরপর আহাদনামা পাঠ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ শেষে সভাপতির সমাপনি বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৯তম বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাশ (২০১৩-২০১৪) অনুষ্ঠিত

গত ২৫/১২/১৩ হতে ০৮/০১/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী ৩টি হালকা মজলিস স্পটে ক্লাস হয়। মৌড়াইল হালকা : গত ২৫/১২/২০১৩ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী মৌড়াইল হালকা মসজিদে হালকার খোদ্দাম, আতফালদের নিয়ে ক্লাস হয়। প্রথম দিন বাদ মাগরীব জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ-এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম এবং মৌলবী আবু তাহের। ক্লাস চলে প্রতি দিন বাদ আসর হতে রাত ৯টা পর্যন্ত।

ভাদুগড় হালকা : গত ০২/০১/২০১৪ তারিখ হতে ০৬/০১/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ভাদুগড় হালকা মসজিদে হালকার খোদ্দাম, আতফালদের নিয়ে ক্লাস হয়। এখানেও প্রতিদিন বাদ আসর হতে রাত ৮.৩০ মি. পর্যন্ত ক্লাস হয়।

আহমদীপাড়া (জামে মসজিদ) : উত্তর আহমদী পাড়া, দক্ষিণ আহমদী পাড়া ও মৌলবী পাড়া হালকার খোদ্দাম, আতফালদের নিয়ে গত ০১/০১/২০১৪ হতে ০৭/০১/১৪ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী ক্লাশ হয় আহমদী পাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ। প্রথম দিন বাদ মাগরীব জনাব জুয়েল আহমদ, জেলা কায়েদ, ক্লাসের উদ্বোধন করেন। কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর বক্তৃতা দেন মৌ. আবু তাহের এবং জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ। প্রতিদিন সকাল ৭টা হতে ১১টা পর্যন্ত এবং বাদ মাগরীব হতে রাত ৮টা পর্যন্ত ২ বেলা ক্লাস হয়।

* সম্মিলিত সমাপনী : গত ০৮/০১/২০১৪ তারিখ বাদ মাগরীব ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামে মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ সকল হালকার খোদ্দাম আতফালদের নিয়ে সম্মিলিত সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। রিজিওনাল কায়েদ এর পক্ষে সাবেক রিজিওনাল কায়েদ ও জামা'তের বর্তমান নায়েবে আমীর জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার সাহেবের সভাপতিত্বে ১ম স্থান অধিকারীগণ কুরআন তেলাওয়াত ও এরপর নযম পরিবেশন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, সর্বজনাব জুয়েল আহমদ, মোশারফ হুসেন, এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। শেষে হালকা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ বছর ক্লাসে কুরআন শুদ্ধ নাযেরা, সূরা মুখস্ত, নযম, বক্তৃতা, অর্থসহ নামায, দ্বীনিমালুমাত, উর্দু ভাষা শিক্ষা, ইসলাম ও আহমদীয়াতের ইতিহাস, হাদিস শিক্ষা ইত্যাদি ক্লাস করানো হয়। তীব্র শীত ও দেশের প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্বেও ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছিল খোদ্দাম ৪৩ জন, আতফাল ১০৯ জন, মোট ১৫২ জন। তন্মধ্যে নিয়মিত ক্লাস করেন খোদ্দাম ২৮ জন, আতফাল ১০৯ জন, মোট ১৩৭ জন। ক্লাসের মাধ্যমে এ বছর কুরআন সবক নেন ১ জন আতফাল।

শামীম আহমদ

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

কেন্দ্রীয় কার্যক্রমের আলোকে ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসকে লক্ষ্য করে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পক্ষ থেকে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ হতে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে খেলা হয়। প্রথম দিন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নায়েবে আমীর জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার দোয়ার মাধ্যমে খেলার কার্যক্রম শুরু করেন, এসময় জেলা কায়েদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও স্থানীয় কায়েদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপস্থিত ছিলেন। খেলায় ১৮ জন খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন। খেলার শেষ দিন বিপুল দর্শক সমাগম ঘটেছিল মাঠে। খেলায় বিজয়ী হন (১) নাসির আহমদ (২) সজিব আহমদ

রাশেদ আহমদ

কৃতী ছাত্র/ ছাত্রী

মরিয়ম কানেতা, ই. ইউনিভার্সিটি গার্লস হাইস্কুল থেকে ২০১৩ সালের ৫ম শ্রেণীর P,S,C পরীক্ষায় G.P.A-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং জামা'তের খেদমত করতে পারে, সেজন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ

আমাদের একমাত্র ছেলে মোহাম্মদ ইফতেখায়রুল হাকিম (সায়েম) নারিন্দা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা থেকে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা'র আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য। তার দাদা মরহুম ডাঃ আব্দুল হাকিম (বীরপাইকশা), নানা সাজিদ মিয়া, (ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'ত)। সে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং জামা'তের খেদমত করতে পারে, সেজন্য জামা'তের ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা-শরীফুল হাকিম আহমদ
মাতা-সেলিনা আক্তার
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

ওয়াকফে জাদীদের ২০১৪ সনের বাজেট প্রেরণ প্রসঙ্গে

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) গত ৩রা জানুয়ারী-২০১৪ জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের ৫৭তম বৎসরের ঘোষণা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমান যুগের আহমদীগণের চাঁদা আদায় ও মালী কুরবানীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন এবং বর্তমান সময়ে মালী কুরবানীর কল্যাণের কথা যারা ওয়াক্‌ফে জাদীদের গত বৎসরের চাঁদা আদায় করেছে, যারা পূর্বের বৎসরের চাঁদা আদায় করেছেন তাদের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেছেন এবং তাদের রিজিকে যেন আল্লাহ্ অনেক অনেক বরকত দান করেন তার জন্য দোয়া করেছেন। হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নতুন বৎসরের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জামা'তের কেহই যাতে এই চাঁদার ওয়াদার বাইরে না থাকেন। প্রয়োজনে ১ (এক) পয়সা দিয়ে হলেও অংশগ্রহণের জন্য বলেছেন।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ২০১৪ সালের ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেট তৈরী করে (নাম ও টাকার পরিমাণ সহ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে পাঠাবেন। উল্লেখ্য যে, মার্চের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বাজেট সম্বলিত রিপোর্ট হুযূর (আই.) এর নিকট পাঠাতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণের এবং অঙ্গসংগঠনসমূহের সহযোগিতা কামনা করছি।

হুযূর (আই.) এর দপ্তর থেকে বার বার তাগিদ আসছে, চাঁদার ওয়াদা যাতে পূর্বের চেয়ে বেশী করা হয় এবং প্রত্যেক জামা'ত এর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০০% পূর্ণ হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
মোবাইল: ০১৭১৪-০৮৫০৭০

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

শুভ বিবাহ

* ০৪/১০/২০১৩ তানজিলা আক্তার, পিতা-মৃত এজাজ আহমদ, গ্রাম-সমসের পুর, পো: উত্তর গাজীপুর, থানা-বরুড়া, জেলা কুমিল্লা, বর্তমান বাড়ী নং ৪৭, রোড নং ১/বি, পশ্চিম নন্দিপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল, পিতা-মরহুম এ,এইচ,এম জুলফিকার আলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা'র বিবাহ ৩,০১,০০১/- (তিন লক্ষ এক হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১১২/১৩

* ১৬/০৮/২০১৩ সামসুন নাহার, পিতা-মরহুম মাওলানা ফারুক আহমদ, শাহেদ, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে মোহাম্মদ আহসান হাবিব, পিতা-মরহুম আহসান আলী, দড়িকান্দি, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১১৪/১৩

* ২২/১০/২০১৩ আঁখি, পিতা-সহিদ আহমদ, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে রফি আহমদ, পিতা-গিয়াস উদ্দিন আহমদ, পো: শহরমূল, জেলা কিশোগঞ্জ-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১১৫/১৩

* ১১/১০/২০১৩ কামরুন নাহার (ইভা) পিতা-মোহাম্মদ হামদে এলাহী, কালঘরা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে মাহবুবুর রহমান জেপী, পিতা-এহেসানুর রহমান ভুইয়া, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১১৬/১৩

*০৫/০৭/২০১৩ ইলমা পারভীন, পিতা-আবুল বাসার আলী, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা'র সাথে সোহাগ আহমদ মোড়ল, পিতা-নুরনবী মোড়ল, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১১৭/১৩

* ২২/১০/২০১৩ নাসরিন আখতার, পিতা-তসদিক আহমদ ভুইয়া, ৩৭৩/১/বি, উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর, ঢাকা'র সাথে মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, Van varenenbergh straetbb 2600 Antwerpen, Belgium -এর বিবাহ ৮,৫০,০০০/- (৮ লক্ষ ৫০ হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১১৮/১৩

* ০৩/১০/২০১৩ আম্বিয়া খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ আমজাদ গাজি, খরিয়াট, আসাঞ্জলি, সাতক্ষীরা'র সাথে মোহাম্মদ সাইফুল সেখ, পিতা-মৃত মজিদ সেখ, ভেটখালি, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১১৯/১৩

* ২৭/১০/২০১৩ তাছলিমা চৌধুরী, পিতা-চৌধুরী লৎফর রহমান, দেবগ্রাম, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে ইজাজ আহমদ, পিতা-কামাল আহমদ, ৬৬১ মধ্যপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র বিবাহ ৭,০০০০১/- (সাত লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১২০/১৩

* ১১/১০/২০১৩ হেপী আক্তার হালিমা, পিতা-মোহাম্মদ নাছির মিয়া, আদমপুর-এর সাথে মোহাম্মদ আল আমিন, পিতা-মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, গালিম গাজী'র বিবাহ ১,৬০,০০০/- (এক লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১২১/১৩

* ১২/১০/২০১৩ ফারজানা আলম তামান্না, পিতা-মোহাম্মদ আবুল খায়ের, জাকির সওঃ বাড়ী, আব্দুল হাকিম মিয়া রোড, মনসুরাবাদ, চট্টগ্রাম-এর সাথে আনিসুল হক জিমি, পিতা-সাইহল হক ভুইয়া, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১২২/১৩

* ১৯/১০/২০১৩ লামিয়া আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ নাসের, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ আমীন, চরদুখিয়া, নুসরাবাদ, চাঁদপুর-এর বিবাহ ৩০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১২৩/১৩

* ২০/১০/২০১৩ আবেদা খাতুন, পিতা-গোলাম আহমদ মীর, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর সাথে একরাম হোসেন, পিতা-আব্দুল মালেক, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১২৪/১৩

* ২৩/০৪/২০১৩ ইসরাত জাহান চায়না, পিতা-মরহুম কালাগাজী খান, শালগাঁও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে রফিকুল ইসলাম, পিতা-আব্দুর রশিদ, হাট চন্দ্রা, জামালপুর-এর বিবাহ ৭৫,০০০/- (পৌঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১২৫/১৩

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তা অন্য কোন কিছুতে তেমন ভালোবাসা দেখা যায় না' (আবু দাউদ)।

তিনি (সা.) অপর এক স্থানে বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করেছে সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে। অতঃপর বাকী অর্ধেকের জন্য সে আল্লাহ্‌কে ভয় করুক' (বায়হাকি)।

আন্তর্জাতিক জামা'তী সংবাদ

হুযূর (আই.)-এর সাথে আহমদীয়া মুসলিম মেডিকেল এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা ও নৈশভোজ

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম মেডিকেল এসোসিয়েশন, ইউ কে'র বার্ষিক সাধারণ সভা লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় ৮৪ জন ডাক্তার এতে উপস্থিত হন এবং সংস্থার বিভিন্ন সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৭০ সালে জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর দিকনির্দেশনায় এই সংস্থার পথচলা আরম্ভ হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এর শাখা সমূহের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো

সকাল সাড়ে ১১ টায় সংস্থার জাতীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মুজাফ্ফর আহমদের সভাপতিত্বে বাইতুল ফুতুহ মসজিদের নাসের হলে এই বার্ষিক সভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

এরপর পুরুষ ও মহিলা ডাক্তারগণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাদের বক্তব্য উপস্থাপনা করেন যেমন, Cardiology ও স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, ইসলাম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক, ইত্যাদি ।

বিকেলের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের আয়োজন করা হয়। এ অধিবেশনে যুক্তরাজ্য জামাতের আমীর রফিক আহমদ হায়াত সাহেব উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিমতের উত্তর নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রদান করেন।

রফিক আহমদ হায়াত সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন আর এতে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুক্তরাজ্যের অগ্রসরতার উল্লেখ করে বলেন, এই বিশাল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উন্নতি, শান্তি ও স্থিতিশীলতা স্থাপনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে।

তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য জামা'তকে সেসব চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুবন্দোবস্ত করতে হবে, যারা স্বদেশে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে এখানে এসেছে, যাতে পরবর্তিতে তারা নিজ দেশে শান্তি স্থাপনে কাজ করতে পারে।

সমাপ্তি অধিবেশনটি খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর অংশগ্রহণে আরো আশিসময় হয়। এ সময় সংস্থার সভাপতি মহোদয় জলসা সালানার সময় সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং Humanity First -এর নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন দুর্যোগ কবলিত স্থানে তাদের চিকিৎসা সেবার বিবরণ তুলে ধরেন।

সমাপ্তি ভাষণে হুযূর (আই.) সবাইকে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দ্যেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যেসব ডাক্তার Humanity First বা ওয়াকফে আরযী'তে সময় দিয়েছেন, তাদের প্রশংসা করে হুযূর বলেন, আরো অধিক সংখ্যক ডাক্তারকে আর্ত-মানবতার সেবার এই মহতি সুযোগ লুফে নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

'আহমদী ডাক্তারদের উচিত বছরে ন্যূনতম ২ সপ্তাহ নিজদেরকে পাকিস্তান বা কাদিয়ানে সেবার জন্য পেশ করা । আমাদের এখানে কর্মরত পেশাদার চিকিৎসকদের উচিত নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে ভাগাভাগি করা। এ দেশের নতুন গবেষণা ও উন্নতিও এখানকার ডাক্তারদের আফ্রিকা, পাকিস্তান, ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ডাক্তার ও হাসপাতালগুলোর সাথে ভাগাভাগি করা উচিত।

এসব মানবসেবামূলক কর্মকান্ড আমাদের জামাতের সৌন্দর্যকে বিশ্বের দরবারে আরো বর্ধিতভাবে উপস্থাপন করে।... এটি সৃষ্টির প্রতি আমাদের জামা'তের গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতা এবং সত্যিকার মানব সেবার অনুপ্রেরণা ও উদ্যমের এক জ্বলন্ত প্রমাণ, এই সেবা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেক দুস্থ মানুষের সেবা করতে চাই'।

সবশেষে হুযূর (আই.) সংস্থার সকল সদস্যকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদিও এ ধরনের জ্ঞান বিনিময় সভার আয়োজন প্রশংসনীয়, কিন্তু আপনাদের প্রকৃত সফলতা ও সার্থকতা সৃষ্টিসেবাতেই নিহিত।

হুযূর (আই.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ যেন সবাইকে তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দান করেন। সমন্বিত দোয়ার মাধ্যমে এ অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এরপর সবার জন্য বিশেষ নৈশ্যভোজের আয়োজন করা হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্, অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ ফযলে গত ১৩, ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মজলিস আনসারুল্লাহ্, অস্ট্রেলিয়ার ২৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিডনির মার্সডেন পার্কে অবস্থিত আহমদীয়া জামাত অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাইতুল হুদা মসজিদে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী এই ইজতেমায় বিভিন্ন ইল্‌মি প্রতিযোগিতার পাশাপাশি নানা রকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। ইজতেমা উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৮৬ জন আনসার এতে যোগদান করেন। তারা বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন এবং দরসুল কুরআনেও অংশ নেন।

ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস এবং ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আনসারগণ উৎসাহে মেতে ওঠেন।

আনসারুল্লাহ্ মজলিসের এবং অস্ট্রেলিয়ার

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুহম্মদ আমজাদ খান, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ অস্ট্রেলিয়া। উদ্বোধনী অধীবেশনে তিনি বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে কুইন্সল্যান্ডে কর্মরত মুবাল্লিগ মওলানা মাসুদ আহমদ শাহেদ তাঁর বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপিত বিভিন্ন আপত্তির জবাব দেন। আর সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় কর্মরত মুবাল্লিগ মওলানা ইমতিয়াজ আহমদ নাভীদের বক্তৃতার বিষয় ছিল "ইসলামে সুদ হারাম"।

ইজতেমার অন্যতম আকর্ষণ ছিল "মেহফিল-এ-মুশায়রা" বা কবিতার আসর। সদর সাহেব আনসারুল্লাহ্ সহ অনেকেই তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর ও মিশনারি-ইন-চার্জ মওলানা মাহমুদ আহমদ শাহেদ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় জামাতের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। পারিবারিক সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে এবং সব বিষয়ে তিনি সত্যবাদীতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আনসারগণ যেন নিয়মিত হুযূর (আই.)-এর খুতবা শোনে এবং সে-অনুসারে আমল করে এবং পরিবারের সদস্যদের তরবীয়ত করে, সেজন্যও তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন। অস্ট্রেলিয়ানদের মাঝে কীভাবে তবলীগ করতে হবে এই বিষয়েও তিনি সহজ কিছু পদ্ধতির উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা শেষ হয়।

লন্ডনে আয়োজিত কাদিয়ান জলসার সমাপনী অধিবেশন সফলতার সাথে সমাপ্ত

গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৩ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভারতের ১২২তম বার্ষিক জলসার সমাপ্তি অধিবেশন কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী এই মহতি জলসায় ১৭ হাজারেরও অধিক জামাতের সদস্যবৃন্দ আধ্যাত্মিক খোরাক লাভের প্রত্যাশায় এতে যোগদান করেন।

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি গন্ড গ্রামে ১৮৯১সালে সর্বপ্রথম এই বার্ষিক জলসার গোড়াপত্তন হয়। শতবর্ষ পূর্বে মাত্র ৭৫জন পুণ্যাত্মার অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে যে যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, আজ তা জগতময় বিস্তৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর ২৬টিরও বেশি দেশে এই জলসা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কোনো কোনো দেশের জলসায় ৪০ সহস্রাধিক মানুষ পর্যন্ত অংশ নিয়ে থাকেন।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উপস্থিতিতে জলসার সমাপনী অধিবেশন আরম্ভ হয় বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদের তাহের হলে। আর এতে যুক্তরাজ্য জামাতের প্রায় ৫ হাজার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল সরাসরি এই অধিবেশন বিশ্বময় সম্প্রচার করে।

মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। জনাব সৈয়দ আশেক হোসেইন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রচিত একটি ফার্সী নযম পাঠ করেন। এরপর জনাব ওমর শরীফ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রচিত একটি উর্দূ নযম পাঠ করেন।

এই অধিবেশনের মূল আকর্ষণ ছিল সম্মানিত হুযূরের সমাপনী ভাষণ। কাদিয়ান জলসায় উপস্থিত জামা'তের সদস্যসহ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশে হুযূর তাঁর বক্তৃতায় সূরা জুমুআর ৪ নাম্বার আয়াত পাঠ করে বলেন, আরব জনবসতিতে যখন বিভিন্ন প্রকার বিভেদ ও হানাহানি শুরু হয়, তারা যখন এক খোদার পরিবর্তে বহু ঈশ্বরের পূজা আরম্ভ করে, তখন তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং খোদার ইবাদতকারী পবিত্র মানুষ বানানোর লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন।

হুযূর বলেন, আজ থেকে ১৩শ বছর পূর্বে হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা.) ইসলামের যে বাণী নিয়ে এই ধরাধামে এসেছিলেন, সেই একই বাণী অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষাকে পুনর্জীবিত করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) পৃথিবীতে এসেছেন।

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেসব পবিত্র মানুষ খোদার কাছ থেকে সরাসরি নিদর্শন দেখে তাঁর হাতে বয়আত করেছিলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদের কয়েকটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন।

হুযূর (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি জলসার সমাপ্তি ঘটে। এরপর হুযূর কাদিয়ান থেকে পরিবেশনকৃত কয়েকটি নযম উপভোগ করেন।

জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ১১ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে Surrey জেলার Haslemere -এ অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের নিজস্ব ভবনে ২০জন সদ্যোত্তীর্ণ মুরুব্বী সিলসিলাহ্-যুক্তরাজ্য জামেয়া আহমদীয়ার দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর পবিত্র হাত থেকে তাদের 'শাহেদ ডিগ্রী'র সনদপত্র গ্রহণ করেন। তাদের প্রত্যেকেই এখন জামা'তের নিয়মিত মুরুব্বী হিসাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবেন। সার্টিফিকেট বিতরণের পর হুযূর (আই.) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রেরণামূলক একটি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, যদিও আপনারা এখন মুরুব্বী হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন, কিন্তু আপনাদের জ্ঞানার্জনের ধারা এখানেই শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে, আপনাদের জ্ঞানার্জনের যাত্রা শুরু হল মাত্র। হুযূর (আই.) বলেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, মুরুব্বীরা শুধু ধর্মীয় পড়াশুনার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ

করে ফেলবেন না, বরং সামাজিক মনোভাব ও প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতেও তাদের দখল থাকা চাই।

হুযূর (আই.) এরপর পবিত্র কুরআনের আলোকে দু'ধরনের ধর্মীয় আলেমের কথা উল্লেখ করেন। একদিকে এমন আলেম-উলামা রয়েছেন, যারা সত্যিকার অর্থেই খোদাকে ভয় করেন, যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে পূর্ণরূপে সমর্পিত থাকেন এবং মানবতার সেবার সুযোগ খুঁজেন। অপরদিকে এমন দুর্নীতি-পরায়ণ এবং নামধারী আলেমও রয়েছে, যারা খোদার পথে মানুষকে আনার পরিবর্তে নিজেরাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আহমদী জামা'তের মুরুব্বীরা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তিনি (আই.) পরামর্শ দেন, এজন্য আহমদীয়া জামা'তের মুরব্বীদের আরও অনেক বেশি বিনয়ী হওয়া উচিত আর নিজেদের জীবনকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষামালার আলোকে সাজানো উচিত।

হুযূর (আই.) এরপর দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা মুরুব্বী হিসাবে আপনাদের জীবন পূর্ণরূপে সার্থক করুন আর সত্যিকার অর্থেই আপনাদের যুগ খলীফার সাহায্যকারী বানান'।

সদ্যোত্তীর্ণ মুরব্বীগণ অচিরেই ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রচারের মানসে স্পেন যাবেন। এরপর আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য জামা'তে আহমদীয়ার মূল কেন্দ্র পাকিস্তানের রাবওয়াতে যাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ডেনমার্কের বিশেষ ওকারে আমল কর্মসূচি

গত বছরের মত এ বছরও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্ক ১লা জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখ কোপেন হেগেন শহরে একটি দৃষ্টান্তপূর্ণ ওকারে আমল কর্মসূচি পালন করে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এই কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ সময় প্রশাসন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে এবং সেখানে উপস্থিত থেকে কর্মীদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

১লা জানুয়ারী বাজামাত তাহাজ্জুদ ও ফযরের নামাযের পর দরস দেয়া হয়। এরপর সবাই প্রাত:রাশ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক খোদ্দাম, আনসার ও তিফলরা সকাল ৯টায় হোপেন হেগেন শহরের টাউন হলের সম্মুখে সমবেত হয় আর সেখান থেকেই ওকারে আমল কর্মসূচি আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচিতে ৪৯জন খোদ্দাম, আতফাল ও আনসার যোগদান করেন।

এ সময় TV2'র ক্যামেরাম্যানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা খোদ্দাম ও আতফালের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে একটি জাতীয়-পত্রিকা Politiken এর প্রতিনিধিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি পালনকালে খোদ্দামরা যে জ্যাকেট পরিধান করেছিল এর পিছনে ***'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'*** লেখা শ্লোগানটি নগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সময় অনেক পথচারী খোদ্দামদের জিজ্ঞেস করেন, কোন্ সংগঠন এই নিঃস্বার্থ সেবা করছে? অনেকে আবার স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে ছবিও উঠিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। অত্যন্ত সফলভাবে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.) এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ) হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহার, তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবের্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করাবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদা তা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামে বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুণরায় সজীব হবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

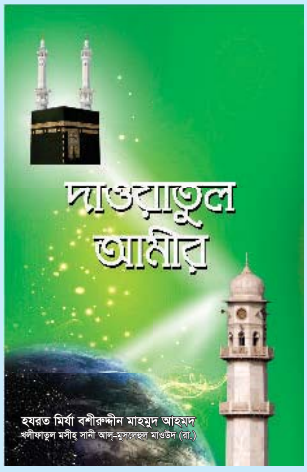

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

New Vol. No. **76** | 14 & 15 Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th February, 2014 Tk. 40.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com